বাংলার শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি ১৯২১-১৯৮২

আবু জাফর মোস্তফা সাদেক

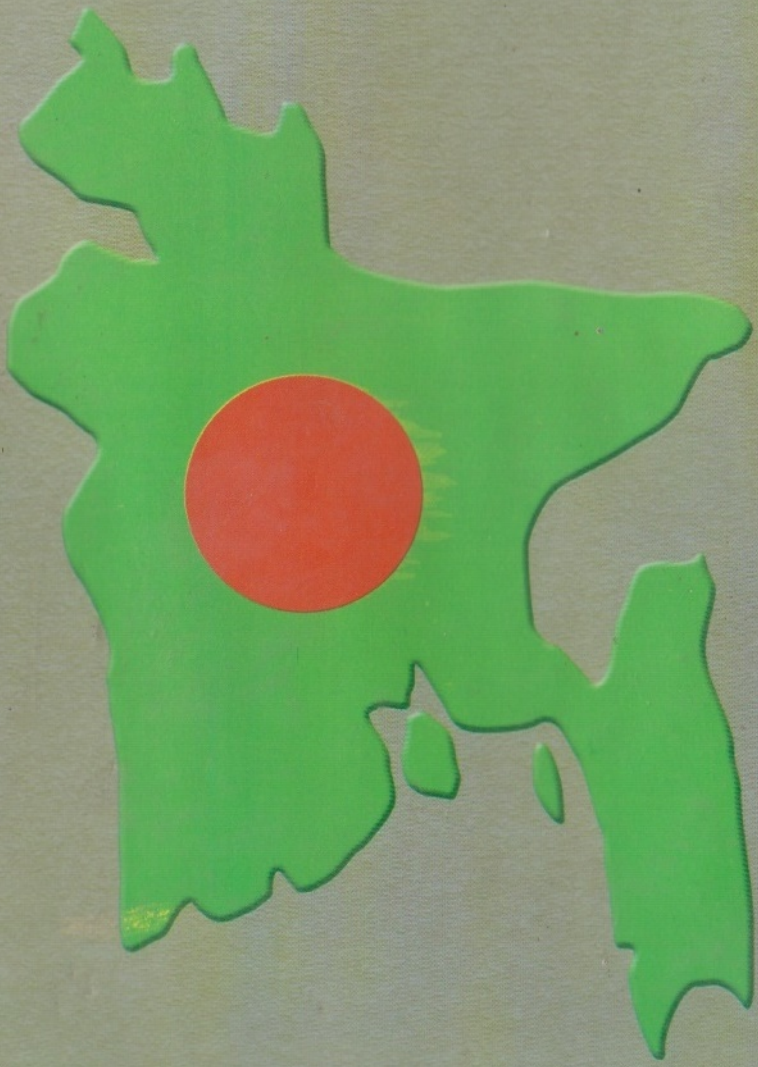

বাংলার
শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি
(১৯২১-১৯৮২)

আবুজাফর মোস্তফা সাদেক

www.pathagar.com

প্রকাশক
এইচ এম ইব্রাহিম খলিল
ন্যাশনাল পাবলিকেশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব
লেখকা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৩
প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান
কম্পোজ ও গ্রাফিক্স
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ আহাম্মদ কমপ্লেক্স (২য় তলা)
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২৮২৮৭
মুদ্রণ
মেসার্স সুপার গ্রীন প্রেস
৬৮/৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
পরিবেশক
রূপসী বাংলা লিঃ
২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট
লন্ডন এস. ডব্লিউ. ১৭ ওএসজি
ফোন ঃ ০২০ ৮৬৭২ ৭৮৪৩
দাম : সত্তর টাকা
US $: 3
£: 2
ISBN 984-711-015-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা
মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ তরফদার
(সমাজ সেবায় ১৯৪২ সালে ভারতের
বড় লাট কর্তৃক সনদপত্র প্রাপ্ত) স্মরণে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বকথা

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে জার্মানিতে কার্ল মার্কস- 'সাম্যবাদ' এবং রেফিজিন ও সুলজি ভিনির্স 'সমবায়বাদ' নীতি উদ্ভাবন করেন। উভয় নীতিরই লক্ষ্য হচ্ছে—(১) রাষ্ট্রই ভূ-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক, (২) সকলে প্রত্যেকের এবং প্রত্যেকে সকলের জন্য, (৩) সংঘবদ্ধভাবে বিক্রয়, (৪) সমবেত মূলধনে বড় পরিকল্পনায় ধনোৎপাদন কর্মপন্থা এবং (৫) রাষ্ট্র ও কৃষকদের মধ্যে দালাল শ্রেণীর বিলোপ। উভয়ের মূল অমিল হলো, সাম্যবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বিলোপ, আর সমবায়বাদে—ব্যক্তি মালিককানা স্বীকৃত। জার্মানিতে প্রথম সমবায় নীতি' স্বীকৃতি পেল, আর ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হলো—সাম্যবাদের আগের স্তর—সমাজতন্ত্র নীতি। অতঃপর পৃথিবীর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সমবায় নীতি আঁকড়ে ধরল, আর অপুঁজিবাদী অনুন্নত রাষ্ট্রের পরাধীন জাতিগুলো সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনচেতা তরুণেরা দেশ ও জাতিকে স্বাধীন করার জন্য একাধিকাবার সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, জীবন দান করেছে। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁদের উদ্দেশ্য পূরন হয়নি। তাই স্বদেশী বা সন্ত্রাসবাদীরা সম্যবাদীতে পরিবর্তীত হয়েছে। এভাবেই এককালের সন্ত্রাসবাদী কর্মী—নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম. এন. রায়)–এর নেতৃত্বে ১৯২০ সালে প্রবাসে (রাশিয়াতে) ভারতের প্রবাসী কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয় এবং ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা স্বীকৃতি পায়।

এদিকে পরাধীন ভারত বর্ষে কমরেড মুজাফফর আহস্বদসহ অন্যান্য বিপ্লবী তরুণেরা নিজ দেশে কমিউনিস্ট মতাদর্শের উপর পড়াশুনা শুরু করেন।

জালিয়ান ওয়ালবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) পর ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার বিরোধী 'অসহযোগ' আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সময় দেশবাসীর কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, তারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে তিনি অবশ্যই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই 'স্বরাজ' আদায় করে দেবেন। গান্ধীজীর এই ওয়াদায় সমগ্র ভারতবাসী এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯২২) চৌরি–চৌরাতে কংগ্রেসের একটি কৃষক মিছিল চলার পথে জঙ্গী

www.pathagar.com

রূপ ধারণ করে। ইংরেজ পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টরের নেতৃত্বে ২১ জন কনস্টেবল এই মিছিলটি ভেঙে দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু মিছিলকারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশ দলকে তাড়া করে। পুলিশেরা জীবন বাঁচাবার জন্য থানায় আশ্রয় নেয়। আর জনতা থানার ঘরগুলোতে তালা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ২২জন পুলিশসহ সমস্ত থানা পুড়ে ভস্মীভূত হয়।

চৌরি-চৌরাও ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও তারা এখন আগের মতো অর্থনীতি চাঙ্গা করতে পারে নাই। এসময় ভারতবাসীকে পরাধীন রাখার জন্য কোনো ব্যয় বহনেও তারা অক্ষম। তাই সরকার তাদের দালাল দেশীয় বুর্জোয়া (ধনীক) শ্রেণীর প্রতিনিধি করম চাঁদ গান্ধীজীর মাধ্যমে কূটনৈতিক চাল চালেন। গান্ধী, নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা ছিলেন দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি—তথা বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব ও ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম রাখার স্বপক্ষে; সব রকম বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। কারণ তাঁরা (কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় নেতারা) জানতেন যে, দেশে কৃষি-বিপ্লব হলে দেশের জনগণের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কায়েম হবে। ফলে তাদের মূল উদ্দেশ্য (বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব ও শোষণ করা) সম্ভব হবে না। তাই গান্ধীজী ১২ই ফেব্রুয়ারি বারদোলিতে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির মিটিং ডেকে তাঁর প্রস্তাবিত গণ-আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। থেমে যায় আন্দোলন এবং জনগণের উপর নেমে আসে সরকারি নিপীড়ন। [গান্ধীজীর ইংরেজ প্রীতি তথা দালালীর বহু প্রামাণ্য দলীল, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড রজনী পাম দত্তের লেখা 'ইন্ডিয়া টুডে' বইটিতে ছাপা হয়েছে]

১৫ই মে প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পাক্ষিক মুখপাত্র "দি ভ্যানগার্ড অব দি ইন্ডিয়ান ইন্ডেপেন্ডেন্স" (ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রসেনা) জার্মানি থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ বছর ফ্যাসিস্ট দলের প্রধান— বেনিতা মুসোলিনী ইতালির প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হলেন। গাজী মোস্তফা কামাল পাশা (আতাতুর্ক) তুরস্ক থেকে বিদেশী গ্রিক ও ইংরেজদের বিতাড়ন করলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় জাপান সাম্রাজ্যবাদের পরদেশ দখলের অগ্রাসী তৎপরতাকে বন্ধ করতে, ওয়াশিংটন কনফারেন্সে ব্যবস্থা নেওয়া হলো। শেষ হলো একটি বিপ্লবী বছর।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। ভারতবাসীর উপর নেমে এল দমন নীতির স্টীম রোলার। ইংরেজ পুলিশ-সেনাবাহিনীর হাতে লাখ লাখ ভারতবাসী নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়ে কবর, শ্মশান আর জেল খানায় ঠাঁই পেল। হাজার হাজার নারী হলো ধর্ষিতা—সতীত্ব গেল। মহাত্মা

www.pathagar.com

গান্ধীজীর আত্মায় এই বিভীষিকাময় অত্যাচারের একটুও ছোঁয়া পেল না। বরং বৈপ্লবিক আন্দোলন ধ্বংস দেখে তিনি তৃপ্তির নিশ্বাস নিলেন। ভাবলেন–আগত দিনে তিনি নিজে শাসন ক্ষমতা হাতে পেলে দেশে তাঁর বিরুদ্ধে এমন কোনো বৈপ্লবিক আন্দোলন হবে না, তিনি সুখেই বুর্জোয়া শাসন শোষণ চালাতে পারবেন। এই শ্বেত সন্ত্রাসে ভারতবাসী পাঁচটি বছর মৃত্যুর সাথে লড়ল।

ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য কাজ করছিলে, তাঁদের অধিকাংশই জেলে বন্দি হয়ে পড়েন। তবুও ১৯২৫ সালে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় গঠিত হয় ভারতের জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল, যা ১৯২৬ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'। ভারতের কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রচেষ্টায় দেশের প্রায় সকল প্রদেশেই এই কৃষক ও শ্রমিক দল গড়ে উঠে এবং ১৯২৭ সালে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাখার প্রতিনিধিদের নিয়ে কলকাতা সম্মেলনে গঠিত হয় সর্বভারতীয় শ্রমিক ও কৃষক দল'। এসময় কমিউনিস্ট কর্মীরা দেশের প্রতিটি শ্রমিক অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে ১৯২৮-২৯ সালে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ভারতের সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট চলতে থাকে।

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের হাতে নেতৃত্ব চলে যায় দেখে কংগ্রেসের ধূর্ত–নেতারা ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং পর বছরের ২৬ শে জানুয়ারিকে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদী নেতা সূর্য সেন (মাস্টার দা)-এর নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। বিপ্লবীদের কাছে থেকে নেতৃত্ব পুনোদ্ধারের জন্য এবার কংগ্রেস নেতৃত্ব ফের 'আইন অমান্য' (সত্যাগ্রহ) আন্দোলন শুরু করে।

'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন কংগ্রেস নেতারা সরকারের সাথে আপোষ করে। ফলে সরকার গ্রেফতার, জেল, জরিমানা ইত্যাদি নিপীড়ন ও শাস্তি দ্বারা এ আন্দোলন দমন করে। এই দমন কর্মকাণ্ডের সময়, অগ্রেফতারকৃত কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরা আত্মগোপন অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ফের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলেন। ফলে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার নেতৃত্বে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও যশোহর এই পাঁচটি জেলায় পার্টির জেলা কমিটি গঠিত হয়। এই সাথে পাটি কমরেডরা প্রকাশ্যভাবে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য কমরেড বঙ্গিম মুখার্জীর নেতৃত্বে 'কিষাণ সভা' গড়তে থাকেন।

ভারতের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই 'প্রজা সমিতির' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা আক্রাম খাঁ, খান বাহাদুর তমীজ উদ্দিন, খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগে যোগদান করলেও বঙ্গীয় প্রদেশের নির্বাচনের মতো, ভারতের অন্যান্য

www.pathagar.com

প্রদেশে মুসলিম নেতারা ভালো ফল করতে পারেন নাই। তাই মি. জিন্নাহ, নির্বাচনের পর পরই কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরুর কাছে, দেশের সকল প্রদেশে লীগ ও কংগ্রেসের 'কোয়ালিশন সরকার' গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু মি. নেহেরু এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেন যে, মুসলিম লীগে কয়েকজন সম্মানী ব্যক্তি আছেন সত্য, কিন্তু এই নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে যে, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল নয়। ফলে মি. জিন্নাহ মুসলীম লীগকে শক্তিশালী করার জন্য নিজ উদ্যোগে বাংলার প্রজা সমিতির নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক, পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ এবং আসামের নেতা স্যার সাদুল্লাহাকে মুসলীম লীগে যোগ দান করান।

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রজা সমিতির প্রধান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

এসময় শ্রমিক, কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর দমন নীতি কিছুটা শিথিল হয়। ফলে এই অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো দ্রুত শাখা বিস্তার করতে থাকে। এসময়ে পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) যে- সব নেতা নেতৃত্ব দেন, তাঁরা হলেনঃ—

কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৩৫-৩৬) : যশোরে কৃষ্ণ বিনোদ রায়, সুকুমার মিত্র, খুলনায় নির্মল দাস, প্রমথ ভৌমিক, রংপুরে অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ী, বিনয় বাগচী, মনিকৃষ্ণ সেন; দিনাজপুরে সুশীল সেন, হাজী মো. দানেশ, সুনীল সেন, বিভূতি গুহ, গুরুদাস তালুকদার; মৈমনসিংহে সুধীন (খোকা) রায়, মনিসিংহ, আলতাফ আলী, পুলিন বক্সী, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, রবি নিয়োগী, পবিত্র শংকর রায়। সিলেটে চিত্ত রঞ্জন দাস, লালা শরদিন্দু দে, দিগেন দাসগুপ্ত, চঞ্চল কুমার শর্মা, অমরেন্দ্রকুমার পাল, দীনেশ চৌধুরী, ঢাকাতে জ্ঞান চক্রবর্তী, নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জী, নিরঞ্জন গুপ্ত, ফনীগুহ, প্রবোধ গুপ্ত, বেনু ধর। চট্টগ্রামে যশোদা চক্রবর্তী, বঙ্কিম সেন, মনোরঞ্জন সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত। নোয়াখালীতে রসময় মজুমদার, জগবান বিশ্বাস, অসিত ঘোষ; কুমিল্লাতে ইয়াকুব মিঞা, সুবোধ মুখার্জী, চন্দ্র শেখর দাস, ফনী মজুমদার; বরিশালে মুকুল সেন, নৃপেন সেন, নীরেন ঘোষ, অমৃত নাগ, জ্যোতি দাশগুপ্ত, হীরালাল দাসগুপ্ত। ফরিদপুরে অনুকুল চ্যাটার্জী, শান্তি সেন, রথীন ঘটক। পাবনায় অমূল্য লাহিড়ী, ঘটু লাহিড়ী, মোহাম্মদ শাহজাহান। রাজশাহীতে শুভ্রাংশু মৈত্র, নির্মল মৈত্র, অরুণ চৌধুরী, জসিম উদ্দিন। বগুড়াতে আব্দুল কাদের, সুধীন চ্যাটার্জী প্রমুখ। প্রকাশ থাকে যে, ইংরেজ সৃষ্ট জমিদী প্রথার বদৌলতে বাংলাদেশের কৃষক প্রজাকূলের মধ্যে মুসলমানেরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। প্রকাশ থাকে যে, এই কৃষক প্রজাদের জমিদার-মহাজনদের শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য মৌলানা আবুল কাশেম ফজলুল হক (শেরে বাংলা) ১৯১৪ সনে "নিখিল বঙ্গ

www.pathagar.com

কৃষকপ্রজা সমিতি" গঠন করে কৃষক-প্রজা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই প্রজা আন্দোলনের উদ্যোক্তরা হলেন শেরে বাংলা, মৌলানা আকরাম খাঁ, খান বাহাদুর তমীজ উদ্দিন, খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন প্রমুখ। অর্থাৎ প্রজা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন খোদ কৃষক নয়, রং মুসলিম উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা। প্রথমে কমিউনিস্টরা এই প্রজা সমিতির ছত্রছায়ায় কাজ করতে থাকেন। ১৯৩৬ সালের ১৬ই ও ১৭ই আগস্ট বাংলার ২০টি জেলার এক প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রকাশ্যে পার্টির নেতৃত্বে কিষাণ সভার একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়।

প্রাদেশিক 'কিষাণ সভার' কেন্দ্রীয় নেতারা হলেন-কমরেড মুজাফফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জী, পুরণ চাঁদ যোশী (পি, সি, যোশী), ভবানী সেন, সুন্দরায়া, নাম্বুদ্রিপদ, সোমনাথ লাহিড়ী, হরকিষাণ সিং, (গাড়োয়াল নেতা), ইরাবত সিংহ (মনিপুরী), আব্দুর রাজ্জাক খান, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, আব্দুল্লাহ্ রসূল, ইয়াকুব মিয়া, চুন্নু মিয়া, মুখলেসুর রহমান প্রমুখ। এখানে প্রকাশ থাকে যে, শিল্পে অনুন্নত কৃষিপ্রধান ভারতে, কমিউনিস্ট নেতারা অধিকাংশ কৃষকদের সংগঠিত করতে ব্যস্ত থাকেন।

শ্রমিক সংগঠক (১৯৩৭-৩৮) : ঢাকার ঢাকেশ্বরী সূতাকলে মৃনাল চক্রবর্তী, সুনীল রায়, ননী চৌধুরী, কুষ্টিয়ার মোহিনী মোহন সূতাকলে রওশন আলী, ধীরেন দাশগুপ্ত। ইস্ট বেঙ্গল রেল (ই, বি, আর) শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সভাপতি-জ্যোতিবসু (পশ্চিম বঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী); চট্টগ্রাম শাখায় হরিসাধনদত্ত; ঢাকাতে ধরনী রায়, মৈমনসিংহে মহাদেব সান্যাল; ঈশ্বরদিতে জসিম উদ্দিন, সৈয়দপুরে বিমল সেন ও সুধীন ধর। (১৯৩৮৩৯) সিলেটের চা বাগানে ও ছাতকের সিমেন্ট কোম্পানির শ্রমিকদের সংগঠিত করেন বারীন দত্ত, দিগেন দাশগুপ্ত, আঙ্গিরা শর্মা প্রমুখ।

ছাত্রসংগঠক (১৯৩৭-৩৮) : 'পূর্ব বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশন', ঢাকাতে মুনীর চৌধুরী, সর্দার ফজলুল করিম, দেব প্রসাদ; মৈমনসিংহে কালু রায়, চট্টগ্রামে চিত্ত বিশ্বাস; বরিশালে অমিয় দাশগুপ্ত প্রমুখ।

মহিলা সংগঠক (১৯৪২) : 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' দিনাজপুরে রানী মিত্র (দাশগুপ্তা), বীনা গুহ; মৈমনসিংহে জ্যোৎস্না নিয়োগী; ঢাকাতে-নিবেদিতা চৌধুরী, হিরণবালা; চট্টগ্রামে কল্পনা দত্ত (যোশী), জ্যোতি চক্রবর্তী; বরিশালে মনোরমা বসু, মনি কুন্ডলা সেন, যুঁই ফুল বোস (রায়); খুলনায় ভানু দেবী, চারু শীলা ঘোষ প্রমুখ।

সংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪১-৪২) : 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' সংগঠন থেকে যাঁরা নাম করেন নাট্য শিল্পী বিমল ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র প্রমুখ। 'প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংস্থা' থেকে কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, কলিম শরাফী, সুচিত্রা মিত্র, নির্মল চৌধুরী প্রমুখ এবং সাহিত্যিক ও কবি হিরেন মুখার্জী, বিষ্ণু দে, সুভাস মুখার্জী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতা ও কর্মী। এছাড়া (১৯৪২-৪৩) ঢাকাতে সাহিত্যিক রনেশ দাস গুপ্ত, কবি– সাহিত্যিক সোমেন চন্দ্র; রংপুরে কণ্ঠশিল্পী বিনয় রায়, মৈমনসিংহে

www.pathagar.com

লোকগীতিকার কবি নিবারণ পণ্ডিত, একতারাবাদক অখিল চক্রবর্তী, চট্টগ্রামে কবিয়াল রমেশ শীল প্রমুখ।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, ১৯৩৫ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'–এর সপ্তম কংগ্রেসে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে ব্রাডলী-পাম দত্ত থিসিস গৃহীত হয় এবং ১৯৩৬ সালে ঐ থিসিস প্রচারিত হওয়ার পর থেকে থিসিস অনুসারে ভারতীয় কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যে তথা কংগ্রেসের লেজুড় হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি পুরা আত্মগোপন সময়টুকু (জুন, ১৯৪২ পর্যন্ত) কংগ্রেস পার্টির লেজুড় বৃত্তি বজায় রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জার্মানির আক্রমণে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এসময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবাসীকে অংশগ্রহণ বা যে– কোনো প্রকার সাহায্য থেকে বিরত রাখার জন্য শ্লোগান তোলে, "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক ভাইও না, এক পাইও না।" সরকার "ভারত রক্ষা আইন" জারি করে যুদ্ধ বিরোধী তথা কমিউনিস্টদের দৃঢ় হাতে দমন করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের মাঝে, অর্থাৎ ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানি, সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করে প্রায় সমগ্র রাশিয়াই দখল করে লয়। এদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ ফ্যাসিস্ট জাপানি সাম্রাজ্যবাদ দখল করে লয়। এই বিশ্ব পরিস্থিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, 'মিত্র শক্তি' (রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন) কে সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত লয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পার্টি, ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করার কথা ঘোষণা করে। ফলে ভারতের ঔপনিবেশিক সরকার, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। জুলাই মাসে পার্টি প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড শুরু করে। এসময় পার্টি নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড ডাঙ্গে, মুজাফফর আহম্মদ, ডা. গঙ্গাধর অধিকারী, ড. এ, আর, চারী, সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন প্রমুখ। পার্টি প্রকাশ্য প্রচার কার্য জোরদার করার জন্য বোম্বাই থেকে সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা "পিপলস", কলকাতা থেকে বাংলা সাপ্তাহিক "জনযুদ্ধ" এবং ঢাকা থেকে "প্রতিরোধ" পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। তখন ঢাকা কোর্টের সামনে জি. ঘোষের গলির (বর্তমান কারকুন বাড়ি লেন) মুখের তিনতলা বাড়ির নিচ তলায় ছিল প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা "প্রতিরোধ" অফিস এবং অফিসের উপর তলায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়মিত বৈঠক বসত।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একমাসের প্রকাশ্য প্রচারে, দেশীয় রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। দেশবাসী ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। কংগ্রেস নেতাদের টনক নড়ে। নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির হাতে চলে যায় দেখে এবং তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে ৯ই আগষ্ট "ভারতছাড়" (কুইট ইন্ডিয়া) আন্দোলন শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু হলেও তাদের

www.pathagar.com

সহযোগী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির উপর আঘাত এসে পড়ে। ফলে ঢাকার প্রগতিশীল সাহিত্যিক সোমেনচন্দ্রসহ দেশের বহু পার্টিক্যাডার ও সমর্থক কংগ্রেসী গুন্ডাদের হাতে শহীদ ও পঙ্গু হন। এত দিন যে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের লেজুড় হয়ে, কংগ্রেসের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে ছিল, আজ সেই পার্টি সুবিধাবাদী লাইন ত্যাগ করে পুরা দক্ষিণ পন্থী লাইন গ্রহণ করার ফলে সেই কংগ্রেস দলের হাতেই চরম মারটা খেল। [বর্তমানের বাংলাদেশের পার্টি/গ্রুপগুলোর এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ।]

কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" আন্দোলন বন্ধ করার জন্য সরকার চরম দমন নিপীড়ন শুরু করে। জনগণ অত্যাচারীত হচ্ছে দেখেও মুসলিম লীগ নিশ্চুপ থাকে। কারণ লীগের দাবি ছিল "ভাগ কর ও ভারত ছাড়" (ডিভাইড এন্ড কুইট ইন্ডিয়া)। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা মো. তোয়াহার নেতৃত্বে লীগের বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভের আয়োজন করে। প্রকাশ থাকে যে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের এক তৃতীয় অংশই ছিল নোয়াখালী জেলার অধিবাসী। এই বিক্ষোভকে শান্ত করার জন্য রাজধানী কলকাতা থেকে নেতারা ঢাকায় ছুটে আসেন। বিক্ষোভ তখনকার মতো শান্ত হলেও এই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পরবর্তীতে "বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন" গঠন করেন। এই সংগঠনে ছিলেন— খন্দকার মোশতাক আহম্মদ (সাধারণ সম্পাদক), মো. তোয়াহা (সহ- সা. সম্পাদক), আজীজ আহম্মদ (সাংগঠনিক সম্পাদক), গিয়াস উদ্দিন (দপ্তর সম্পাদক) প্রমুখ।

বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতের সম্মানিত ব্যক্তি বর্গকে নিয়ে "ওয়ার কাউন্সিল" গঠন করে। ভারত বর্ষের প্রাদেশিক মন্ত্রীরাও পদাধিকার বলে এই কাউন্সিলের সদস্য মনোনিত হন। কিন্তু লীগপ্রধান মি. জিন্নাহ, দলীয় সদস্যদের এই সংগঠন ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। ফলে দেশের যে কয়টি মুসলিম লীগের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সবাই একযোগে পদত্যাগ করেন। কিন্তু বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা, জিন্নার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযোগ নামা পেশ করে পদত্যাগ করেন। এতে মি. জিন্নাহ ক্ষেপে যেয়ে, বাংলাদেশ থেকে শেরে বাংলার জনপ্রিয়তা খর্ব করার জন্য ১৯৪২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক সম্মেলন আহ্বান করেন।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, 'শেরে বাংলা' বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়ে, "ঋণশালসী বোর্ড আইন" (১৯৩৮); "প্রজাসত্ত্ব আইন" (১৯৩৯); "মহাজনী আইন" (১৯৪০); কলকাতা কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যকরী করার ফলে বাংলায় তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

যাই হোক, মি. জিন্নাহ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ঢাকার ছাত্র সমাজ এই সম্মেলনে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই ছাত্ররাই পরবর্তীকালে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে ছিল।

www.pathagar.com

কংগ্রেস–"কমিউনিস্টরা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলে জাতীয় ঐক্য ভাঙতে চায়", "কমিউনিস্টরা রাশিয়ার দালাল" এবং মুসলিম লীগ–" কমিউনিস্টরা আল্লাহ মানে না", "ধর্ম মানে না" প্রভৃতি বলে অপপ্রচার চালিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রযাত্রা বন্ধ করতে পারেনি। বরং নিজ দলেই দলাদলি শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেসের, গান্ধীজীর বিরুদ্ধে নেতাজী এবং মুসলিম লীগে হাশিম-সোরওয়ার্দীর সাথে আকরাম–নাজিমুদ্দিনের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার প্রথম সম্মেলন প্রকাশ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১১ জনের নতুন প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচিত হয়। কমিটিতে ছিলেন, (১) মুজাফফর আহম্মদ, (২) ভবানী সেন, (৩) সোমনাথ লাহিড়ী, (৪) সরোজ মুখার্জী, (৫) বিশ্বনাথ মুখার্জী (৬) আব্দুল মোমিন, (৭) খোকা রায় (৮) রনেন সেন, (৯) নেপাল নাগ, (১০) নৃপেন চক্রবর্তী ও (১১) তুষার চ্যাটার্জী। সম্পাদক মন্ডলী গঠিত হয় (১) ভবানী সেন, (২) সরোজ মুখার্জী ও খোকা রায়কে নিয়ে এবং এই প্রাদেশিক শাখা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ভবানী সেন। সম্মেলনে "জনযুদ্ধের নীতি" প্রস্তাবটি সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়।

১৯৪৩ সালের ১০ই, ১১ই ও ১২ই সেনলিতাবাড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার ষষ্ট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন—কমারেড মুজাফফর আহম্মদ, বঙ্কিম মুখার্জী, সৈয়দ নওশের আলী, প্রমথ ভৌমিক, হাজী মো. দানেশ। এই কিষাণ সম্মেলনে 'তে-ভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই ঐতিয্যবাহী মে মাসেই বোম্বোতে নিখিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন—পি. সি. যোশী, বি. টি. রনদীভে ও ড. গঙ্গাধর অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন—পি. সি. যোশী। এই কংগ্রেশে কমরেড যোশীর "বুর্জোয়া পার্টিকে সহযোগীতা থিসিস গৃহীত হয়।

ব্রিটিশ শাসকদের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে 'শেরে বাংলা' বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ব্যারিস্টার জিন্নাহর চাটুকার ঢাকার নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হন। তখনও বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-রাজ যুদ্ধের ব্যয় চালাতে গিয়ে ভারতবাসীর উপর ভয়াবহ সংকট চাপিয়ে দেয়।

এই সময় জাপানি আক্রমণে পার্ল হার্বরে মার্কিন নৌঘাঁটি এবং সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ নৌঘাঁটি ধ্বংস হয়।

এতে তৎকালীন পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ" প্রিন্স অর ওয়েলস" এবং "রিপালস" নিমার্জ্জত হয়। নেতাজী সুবাসচন্দ্রসুর নেতৃত্বে জাপানের সাহায্য-সহযোগতায় আজাদ হিন্দু ফৌজ আসামের কহিমা পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষ

দেশীয় অবাঙালি বুর্জোয়ারা প্রচার চালায় যে, বাংলার খাদ্যশস্য শত্রু সেনার রসদ যোগাবে এবং তারা সরকারের সহযোগিতায় চড়া দামে বাংলার সমস্ত খাদ্য-শস্য কিনে নিয়ে মজুদ করে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পাঁচ মাসের শাসন আমলে আগস্ট (১৩৫০ সনের ভাদ্র) মাসে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। এসময় খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন শহীদ সোরওয়ার্দী। বাংলার ঘরে ঘরে আহাজারী। এসময় কলকাতার ইডেন গার্ডেনের খোলা আকাশের নিচে লক্ষ লক্ষ মন খাদ্যশস্যের বস্তা সাজান থাকে। এই খাদ্যশস্যের সাজানো তাকের নিচ থেকে ছয়টি বস্তা পর্যন্ত পঁচে যায়, তবুও তা জনগণের মধ্যে বিতারণ করা হয় না। কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে ভিক্ষা, সাহায্য ও চাঁদা তুলে বাংলার দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে ত্রাণ কাজে নিয়োজিত হয়। বাংলার ছাত্র যুব সমাজও এ-কাজে এগিয়ে আসে।

ঢাকা শহরের অনেকগুলো নঙ্গর খানায় ছাত্ররা কাজ করতে থাকে। তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভষ্ট ড. মোহাম্মদ হোসেন ও অধ্যাপক কবি জসিমউদ্দিনসহ অন্যান্য অধ্যাপকদের উৎসাহে মোহাম্মদ তোয়াহা একদল ছাত্র নিয়ে নয়াবাজারের সিরাজদ্দৌলা পার্কের নঙ্গর খানার কাজে ব্যস্ত ছিল। এসময় কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ছিল বুর্জোয়া পার্টিকে সহযোগিতা এবং রণকৌশল ছিল মুসলিম বংশোদ্ভুত কর্মীদের মুসলিম লীগে এবং হিন্দু বংশোদ্ভুত কর্মীদের কংগ্রেসে কাজ করা, তাই পার্টির নির্দেশে মো. তোয়াহা, পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আঞ্চলিক অফিস ১৫০, মোগল টুলিতে যেয়ে হাজির হলেন। তখন এই অফিসের ভারপ্রাপ্ত (ইনচার্জ) কর্মী ছিলেন তাঁর অন্যতম বন্ধু শামছুল হক। তিনি বন্ধুকে লীগের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়া প্রস্তাব দিলে বন্ধু আনন্দে বিহ্বল হয়ে বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বুঝে ছিলেন-রাজধানী কলকাতার চেয়ে মফস্বল ঢাকার মুসলিম লীগের সংগঠন ছিল মুমূর্ষ এবং তা আহসান মঞ্জিল বা নবাব বাড়িতেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবাব পরিবারের সদস্য নয় এমন ব্যক্তি ঢাকাতে নেতৃত্ব করতে দেওয়া হতো না। ১৯৪৪ সালে আ. হাশেম, বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি পূর্ব বাংলায় সাংগঠনিক সফরে আসার প্রাক্কালে নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন গং তাঁর সফরকে ব্যর্থ করার চেষ্টা চালান। কারণ নব নির্বাচিত সম্পাদক, মি. জিন্নাহ বিরোধী মতো পোষণ করতেন। মি. জিন্নার 'দ্বিজাতি' (হিন্দু-মুসলমান) তত্ত্ব তথা ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্র গঠনকে অবাস্তব বলে আবুল হাশেম সাহেব মতো প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি দেখান উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ভাবধারা,

www.pathagar.com

সীমান্তের ওপারে আফগানদের সাথে এক, তবুও পাঠান ও আফগানরা এক জাতি নয় কেন? তিনি বলেন যে, একটি জাতি গঠনের পক্ষে কেবলমাত্র কোনো একটি ধর্মীয় বন্ধনই যথেষ্ট নয়। সুতরাং বাংলার মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এই মত–দ্বন্দ্বে শহীদ সোরওয়ার্দী সম্পাদকের পক্ষে এবং নবাব নাজিমুদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে তথা মি. জিন্নার পক্ষে দাঁড়ান।

১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের পরেই মুসলিম লীগে এই দ্বন্দ্বটি দেখা দেয়। আবুল হাশেম সাহেবের বক্তব্যটিকে বলা হতো প্রগতিশীল। আবুল হাশেম সাহেব, বাংলা ভাষার ভিত্তিতে আসাম প্রদেশ ও বাংলা প্রদেশ নিয়ে পুনর্গঠিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, তা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের মনেও দাগ কাটে। তাই পরবর্তীকালে ফরয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎ চন্দ্র বসুর সাথে তিনি ঘরোয়াভাবে যেসব আলোচনা চালান, তাতে ইতিবাচক ফল দেয়। উভয় নেতা আলোচনা শেষে "অখন্ড বাংলার" যে রূপ রেখা নির্ধারণ করেন, তা সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হলো—

"(১) বাংলাদেশ অন্তবর্তীকালীন অবস্থায় ভারত অথবা প্রস্তাবিত পাকিস্তানে যোগদান না করে স্বাধীন থাকবে।

(২) বাংলাদেশ, ভারতে যোগ দেবে, না স্বাধীন থাকবে সে প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হবে যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে গণভোট মারফত এবং তা নির্ধারণ করবে এবং বাংলাদেশের জন্য গঠিত বাংলাদেশ পরিষদ।

(৩) বাংলাদেশ জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে হিন্দু, মুসলিম, তফসিলী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে।

(৪) বাংলাদেশের তৎকালীন ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেস মনোনীত সদস্যদের নিয়ে পুনগর্ঠিত করা হবে এবং তা অন্তরবর্তীকালীন সরকার হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবে।"

যাই হোক, আবুল হাশেমের পূর্ব বাংলা সফরকে স্বার্থক করে তোলার জন্য, বিশেষ করে সম্মেলন সফল করার জন্য শামছুল হক, বন্ধু-ছাত্রনেতা মোহাম্মদ তোয়াহা ও শামছুদ্দীনের উপর সফর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। প্রকাশ থাকে যে, তাঁর পূর্ব বাংলা সফর উপলক্ষে চালাক চরে–পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। চালাকচর, পোড়াদিয়া, রাজন ও বেলাবো তালুকগুলির জমিদার ছিলেন ঢাকার নবাব। তাই নবাব সাহেবের নির্দেশে তাঁর প্রজাগণকে সংগঠিত করতে ঢাকা থেকে পাঠান হলো একদল ভাড়া করা গুণ্ডা ও লাঠিয়াল। এদের কর্মকাণ্ডে অঞ্চলের মুসলিম প্রজারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে।

এদিকে মোহাম্মদ তোয়াহা গোপনে তাঁর মূল্য পার্টিকে জানায়ে একদল যুব কর্মীসহ

www.pathagar.com

চালাক চরে যেয়ে হাজির হন। পার্টির আঞ্চলিক নেতা কমরেড অন্নদা পাল একদল যুব কর্মীসহ চালাক চরে যেয়ে হাজির হন। পার্টির আঞ্চলিক নেতা কমরেড অন্নদা পাল চালাক চর বাজারে মোহাম্মদ তোয়াহার দলকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু মুসলিম লীগের কোনো কর্মীই গুণ্ডাদের ভয়ে সেখানে যেতে পারেনি। পার্টির নেপথ্য সহযোগিতায় মোহাম্মদ তোয়াহার দল বাজান চরের সম্মেলন সুষ্টভাবে সমাধা করেন এবং এ অঞ্চলের প্রজাগণ আবুল হাশেমের বক্তৃতা শুনে নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তার কারণ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম সাহেবের পুরো বক্তৃতায় ছিল শোষণমুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক পাকিস্তান গড়ার পক্ষে। তবে সম্মেলন চলাকালে নবাব নাজিমুদ্দিনের গুণ্ডা দল সভায় আক্রমণ করলে সুগঠিত পার্টিকর্মীদের তাড়া যেয়ে জান নিয়ে পালায়। কিন্তু মারামারির এক পর্যায়ে গুণ্ডারা কমরেড অন্নদা পালের মাথা ফাটায়ে আহত করে।

১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল যুব ছাত্রদের নিয়ে দুটি সংগঠন গঠিত হয়। (১) ছাত্র ফেডারেশন এবং (২) গণতান্ত্রিক যুবলীগ। এই সংগঠন দুটির সভাপতি নির্বাচিত হন মো. তোয়াহা।

১৯৪৫ সাল থেকে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভাকিয়া, চেকো শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশগুলো রাশিয়ার সাহায্যে এবং নিজ নিজ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একের পর এক জয়লাভ করতে শুরু করে। রুশ সাহায্যে ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা জনগণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। এছাড়া কোরিয়া, ভিয়েৎনাস, কম্বোডিয়া, লাওস, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি "ফরওয়ার্ড টু ফ্রিডম" পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকাতে বলা হয় "বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ, জনগণের হাতে বন্দী" এবং "এই যুদ্ধে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তির বিজয়ের ফলে ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্য" অর্থাৎ জার্মানি ফ্যাসীসদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গং জয়ী হলে ভারতবাসী স্বাধীনতা পাবে। পার্টি নেতাদের এই চিন্তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল হিন্দুস্থান পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু এই স্বাধীনতায় ভারতের কোনো জাতিরই স্বাধীনতা আসেনি, এসেছিল একটি শ্রেণীর স্বাধীনতা। এই শ্রেণীটির নাম বুর্জোয়া বা ধনীক শ্রেণী। এই শ্রেণীটি ভারতের একাধিক জাতির একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, বিদেশী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন শোষণের পরিবর্তে এদেশের জনগণকে নিজেরা শাসন-শোষণ করবে। তাই তারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলে জড়ো হয়ে ছিল। টাটা, বিড়লা প্রমুখ ধনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ধনীক শ্রেণীর আদর্শে পালিত ব্যারিস্টার গান্ধী, ব্যারিস্টার নেহেরুপ্রমুখ নেতারা

www.pathagar.com

কংগ্রেস দলে নেতৃত্ব করছিলেন। অপর দিকে আদমজী, দাউদ, বাওয়ানী, জিন্নাহ প্রমুখ মুসলিম উঠতি ধনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ দলের নেতৃত্বে ছিলেন, ব্যারিস্টার জিন্নাহ্, নবাব লিয়াকত আলী খান, নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ।

দুটি ঘটনা

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ-ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ 'তলোয়ার' বোম্বে বন্দরে নোঙ্গর করে। এই যুদ্ধ জাহাজের সকল অফিসার সৈনিকই ছিলেন বাঙালি। তাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলনে পরাধীন দেশবাসীর পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বোম্বে বন্দরেই 'তলোয়ার' যুদ্ধজাহাজ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নৌসেনারা দেশবাসী ও জাতীয় নেতাদের এই সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের ডাক দেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় নেতারা নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে এই ডাকে সাড়া দিল না। এমনকি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও শুধু দর্শকের ভূমিকা পালন করলেন। তলোয়ার জাহাজের সেনারা অন্যান্য ব্রিটিশ জাহাজের সাথে তিনদিন যুদ্ধ চালায়ে গেল এবং পরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের উপদেশে তারা আত্মসমার্পন করেন। ব্রিটিশ সরকার সুযোগ পেয়ে এই জাহাজের সবাইকেই বিভিন্ন মেয়াদে জেলে পাঠাল।

অপর ঘটনাটি হলো "আজাদ হিন্দ যৌজ' এর পরাজয়। যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটলে আজাদ হিন্দু ফৌজের সকল সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা আসামে কোহিমা পর্যন্ত এসে থেমে পড়ে এবং ভারতের ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে বন্দি হয়। বিচারে এই সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন ও ক্যাপ্টেন রশীদ আলীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়। যেহেতু আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক দল (বামপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর দল) ফর ওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু। তাই এই অফিসারদের সাজাকে কেন্দ্র করে ভারতে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ভারতবাসী রশীদ আলীকে "জাতীয় বীর" বলে ঘোষণা দেয় এবং তাঁর মুক্তির জন্য দেশের সর্বত্র" রশিদ আলী দিবস" পালিত হয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে অংশ নিলেও স্বতন্ত্রভাবে কিছুই করেনি।

১৯৪৬ সালের ২৯শে আগস্ট সাধারণ নির্বাচনের সময় কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা নিজ জেলা নোয়াখালীতে ভোটের কাজে ব্যস্তছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন শহীদ সোরওয়ার্দীর টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি সাথে সাথেই রাজধানী কলকাতায় চলে যান। শহীদ সাহেব তাঁকে বুঝিয়ে গফুর গাঁয়ে পাঠায়ে দেন— মুসলিম লীগ ভোট প্রার্থী গিয়াস উদ্দিন পাঠানের পক্ষে কাজ করার জন্য। এখানে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইসরৎ পার্টির

www.pathagar.com

প্রধান মওলানা শামছুল হুদা। তোয়াহা সাহেব গফুর গাঁও পা দিয়েই বুঝতে পারেন যে, এলাকাবাসী হুদা সাহেব ছাড়া অন্য কারও নাম ফুনতে চায় না। তোয়াহা সাহেব লীগ নেতাদের এ অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যান্য অঞ্চলে কাজ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু নেতারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। ফলে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেও লীগ নেতার জামানতও বাঁচানো গেল না। এটা ছিল মোহাম্মদ তোয়াহার জীবনের প্রথম পরাজয়। তবুও লীগ নেতা শহীদ সোরওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন।

ক্যাবিনেট প্লান

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য স্যার রাডক্লিফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি মিশন ভারতে আসে এবং এই মিশন ভারতের বিভিন্ন অংশের বিভাগের যে পরিকল্পনা দেন তা ক্যাবিনেট মিশনের গ্রুপিং প্লান নামে পরিচিত। এই মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রুপিং পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনায় পূর্বভারতে আসামের নেফা-মনিপুর থেকে সমস্ত বাংলাদেশ ও বিহারের বাংলাভাষী পুর্নিয়া জেলা নিয়ে একটি প্রাশাসনিক অঞ্চল গড়ার কথা বলা হয়। ইহা ছিল মূলত আবুল হাশেম ও শরৎচন্দ্র বসুর "বৃহত্তম বাংলা" পরিকল্পনা। অনেকের ধারণা যে, এই 'অখণ্ড বাংলা'র কথা বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ জানতেন এবং তিনিই স্যার র‍্যাডক্লিফের নিকট বাংলা ভাগ না করে অখণ্ড বাংলা রাখার প্রস্তাব দেন।

প্রাদেশিক লীগ নেতা সোরওয়ার্দী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা, কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ নেতা এই অখণ্ড বাংলার পক্ষে সমর্থন দেন এবং এই নেতাদের প্রচেষ্টায় গান্ধীজী ও মো. জিন্নাহও বঙ্গভঙ্গের পক্ষেই মতো প্রদান করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী এবং হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যাম প্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ সাম্প্রদায়িক নেতারা এই অখণ্ড বাংলার বিরোধিতা করেন। ২৪ শে মে কংগ্রেস "স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারত" এর গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৩রা জুনের বৈঠকে লীগপ্রধান মো. জিন্নাহ, স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্র গঠনের জন্য বাংলায় গণভোট বা 'রেফারেন্ডাম' দাবি করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এই দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানায়।

মুসলিম লীগের ঘোষণার পর ভারতের বড় লাট লর্ড ওয়াভেল এক বিবৃতিতে বলেন, "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া ঠিক নয়।" তিনি মুসলিম নেতাদের মতামতকে পাত্তা না দিয়েই ১২ই আগস্ট পণ্ডিত নেহেরুকে সরকার গঠন করতে নির্দেশ দেন। কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের হাতে কোনো অঞ্চলের শাসনভার ছেড়ে দিতে নারাজ। তাঁরা গোপনে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'কে বানচাল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ দাবি দিবসকে কেন্দ্র করে লীগের আবুল হাশেম গ্রুপের পূর্ব বাংলার কর্মীরা অর্থাৎ সামছুল হক, মো. তোয়াহা, কামরুদ্দিন, তাজউদ্দিন প্রমুখ যাঁরা 'ঢাকা গ্রুপ' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা এক ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক করেন যে, এই আন্দোলন যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে তাঁরা আত্মগোপন করে জয়দেবপুর কাম্পাশিয়া অঞ্চলকে গেরিলা অঞ্চলে পরিণত করবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, কথিত ঢাকা গ্রুপের নেতৃত্বকারী প্রায় সকলেই ছিলেন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য-সমর্থক। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে প্রত্যেক আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক কমিটিকে ঐ দিনটি মিছিল ও জনসভা করে পালন করতে নির্দেশ দেন।

মুসলিম লীগের ঢাকা গ্রুপ ১৬ই আগস্ট পালনের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেন, তা হলো তাঁরা প্রথমেই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ করে কর্মসূচি তৈরি করেন, যাতে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মনোভাব প্রমাণ করবে যে তাঁরা বাংলাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পেতে চায়। এখানে প্রকাশ থাকে যে, তখন ঢাকা শহরে গান্ধী-নেহেরুর কংগ্রেসের বিদ্রোহী কংগ্রেস অর্থাৎ ফরওয়ার্ডব্লকের এবং জিন্না-নাজিমের মুসলিম লীগের থেকে হাশের-সোরওয়ার্দ্দীর মুসলিম লীগ গ্রুপ খুবই শক্তিশালী ছিল। ঢাকা গ্রুপের আহ্বানে ফরওয়ার্ড ব্লাকের নেতারা হিন্দু মহল্লা তাঁতি বাজার, শাখারী বাজার এলাকার শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিও প্রয়োজন মতো সাহায্য সহযোগিতার জন্য এ গিয়ে আসল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে ঢাকার শহরের চক বাজার থেকে একটি বিরাট মিছিল, ইসলামপুর, পটুয়াটুলি, জনসন রোড, ইংলিশ রোড হয়ে (নয়াবাজারের) সিরাজদৌলা পার্কে এসে শেষ হয় এবং মিছিল শেষে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় মুসলিম লীগ ছাড়াও ফরওয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেরও বক্তব্য রাখতে সুযোগ দেওয়া হয়।

ঢাকার শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও মিছিলের কাজ শেষ করে লীগ নেতা তথা ঢাকা গ্রুপের নেতারা যখন আঞ্চলিক অফিসে বসে আড্ডা আলোচনায় রত, তখনই রাজধানী কলকতা থেকে ফোনে জানানো হলো —রাজধানীতে পুলিশ গুলী চালিয়েছে। তখনও ঢাকার নেতারা মনে করছেন যে এবার ব্রিটিশকে বেশ চাপ সৃষ্টি করা গেছে, সুতরাং সরকার নিশ্চয়ই এবার লীগের দাবি 'পাকিস্তান' তৈরি করতে রাজী হবে। কিন্তু পরদিনই পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর প্রকাশ হলো। এই খবরের সাথে সাথে অনেক পত্রিকায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালানো হলো।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় নেতারা ছাড়া বাকি সমস্ত হিন্দু নেতারা মুসলিম লীগের এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'কে বিকৃত করে প্রচার

www.pathagar.com

চালিয়ে লোমহর্ষক এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করেন। ফলে মাত্র তিন দিনেই শুধু মাত্র রাজধানী কলকাতায় হাজার হাজার নর-নারী-শিশুকে হত্যা করা হলো।

ঢাকায় লীগ, কমিউনিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কর্মীরা যৌথ সেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে শহরে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হলো। কলকাতার দাঙ্গা থেমে গেল কিন্তু হঠাৎ খবর পাওয়া গেল— নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। মোহাম্মদ তোয়াহা লীগের পক্ষ থেকে দাঙ্গা বন্ধ করতে নিজ জেলায় ছুটে গেলেন। দাঙ্গার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে কমরেড মুজাফফর আহম্মদের নেতৃত্বে কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাও নোয়াখালী এসে পৌছালেন।

কলকাতার পত্রিকায় যেভাবে দাঙ্গার খবর ছাপা হয়েছিল, ঠিক তেমন কোনো দাঙ্গা নোয়াখালীতে হয়নি। জানা যায়- কলকাতা থেকে দাঙ্গায় বেঁচে খাওয়া একজন মুসলিম যুবক এলাকায় ফিরে এসে প্রচার করেন যে, তিনি দাঙ্গায় দত্ত পাড়ার চৌধুরী বাড়ির একটি ছেলেকে নেতৃত্বে দিতে দেখেছেন। তখন এই গ্রামে দাঙ্গা বেধে যায়। তবে তা নদী পার হয়ে নোয়াখালী শহরে এসে পৌছাতে পারেনি। কারণ নোয়াখালীর আঞ্চলিক কমিউনিস্ট নেতা কর্মীরা দাঙ্গাকারীদের শহরে প্রবেশ করতে দেননি।

কলকাতার খবরের কাগজের মিথ্যা খবরে বিভ্রান্ত হয়ে গান্ধীজী নোয়াখালী সফরে আসেন এবং তিনি এখানে প্রায় ৩/৪ মাস অবস্থান করেন। তাঁর এই দীর্ঘ অবস্থানে ভারতের অন্যান্য স্থানে বিকৃতভাবে নোয়াখালী দাঙ্গার খবর ছাপানো হয়। ফলে সমস্ত ভারত বর্ষের সংখ্যালঘু মুসলমান নর-নারীর উগ্র হিন্দু-শিখ দাঙ্গাকারীদের হাতে গরু-ছাগলের মতো জীবন দিতে থাকে।

কলকাতার লোমহর্ষক দাঙ্গার খবর বিলাতে পৌছালে ব্রিটিশ সংসদ ভারতের বড় লাটের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে লর্ড ওয়াভেল ২৫শে আগস্ট কলকাতা ও পরে ঢাকা সফরে আসেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোরওয়ার্দীর পরামর্শে ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে ৮ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বড় লাট, মো. জিন্নার সাথে এক আলোচনা বৈঠকে বসেন। মি. জিন্নাহ ১০ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচি নির্ধারনের আহ্বান জানান।

এদিকে ভূপালের নবাবের উদ্যোগে গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে এক সমঝোতা হয়। ফলে ৪ঠা ও ৮ই অক্টোবর জিন্নাহ-নেহেরু দু'টি আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনার পর মি. জিন্নাহর নির্দেশে নেহেরুর আন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলিম লীগের সদস্যরা যোগদান করেন।

বছরের শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে কৃষক সমিতি রংপুর দিনাজপুরেও জলপাইগুড়ি জেলায় শ্লোগান তোলা হয়, নিজ খোলানে ধান তোলো, আধি নয়-তেভাগা চাই। এভাবেই শুরু হয় সারা বাংলাদেশে তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলনে বাংলার

www.pathagar.com

৬০লক্ষ বর্গাচাষী অংশগ্রহণ করেছিল এবং এই সশস্ত্র সংগ্রামে প্রায় বার হাজার বর্গাচাষী হতাহত হয়।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভীত হয়ে পড়ে। তাঁরা নিজ দেশের সরকারেকে ভারতে নিজেদের পুঁজিবিকাশের পরিবেশ তৈরি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই তাঁরা ভারত ত্যাগ করবে এবং প্রয়োজন হলে ভারতবাসীর ইচ্ছা অনুসারে ভারতকে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে রাজী আছে। তিনি লর্ড ওয়াভেলকে ভাইসরের পদ থেকে অপসারন করে, তাঁর স্থানে লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে ভারতে পাঠান। লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ২৪ শে মার্চ বড় লাটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই চেষ্টা করেন, মুসলিম নেতারা যেন ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করেন।

৩রা মে লর্ড মাউন্ট ব্যাটন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করেন যে, মুসলিম লীগ নেতারা তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারলে, তিনি পণ্ডিত জওহার লাল নেহেরুর অন্তর্ববর্তীকালীন সরকারের হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দিয়ে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়েই ভারত ত্যাগ করবে। এখানে প্রকাশ থাকে লর্ড মাউন্ট ব্যাটন, মি. জিন্নাহকে প্রস্থাব দেন যে, 'পাকিস্তান' সৃষ্টির পর তিনি উভয় দেশের গর্ভর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেন—তিনি নিজেই পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল হবেন। জিন্নাহ-ব্যাটন দ্বন্দ্বের সুযোগ কংগ্রেস গ্রহণ করে। কংগ্রস নেতারা স্বাধীন ভারতের গর্ভনর হিসেবে লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে মেনে নেন। বড় লাট ৩ রা জুন ঘোষণা দেন— বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে ভাগ করা হবে।

ভারত ঘেঁষা নেতৃত্ব

ক্যাবিনেট মিশনের গ্রুপিং প্রস্তাব বাতিল হয়ে যখন র‍্যাডক্লিপের পার্টিশন কাউন্সিল ঘোষণা করল— মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ জেলাগুলোর ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করা হবে, তখন যোশী— অধিকারীর নেতৃত্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি " পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য" থিসিস ভুল বলে মূল্যায়ন করল। তাই পার্টির এক সার্কুলারে কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হলো (১)পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র, আর ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র; (২)পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তাই সেখানে গণতন্ত্র নেই, কিন্তু ভারতে আছে, (৩) পাকিস্তানে এখনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন জন্ম নেয়নি, কিন্তু ভারতে এ আন্দোলন খুবই শক্তিশালী। সুতরাং ভোটাভুটির সময় কর্মীরা যেন জেলা বা অঞ্চলগুলোতে ভারতভুক্তির পক্ষে প্রচার চালায়।

www.pathagar.com

পার্টি সার্কুলারে কাশ্মির সম্বন্ধে বলা হলো— কাশ্মির ভারতে যোগদান করলে সেখানকার অধিবাসীরা (প্রায় সবাই মুসলমান) ভারতে যোগদান করলেই তাদের তাড়াতাড়ি মুক্তি হবে।

সিলেট সম্বন্ধে বলা হলো— যেহেতু পাটিশন কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, গণভোটের মাধ্যমেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে, সুতরাং কর্মীরা যেন অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের পক্ষেই প্রচার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

এসময় কমরেড খোকা রায়কে সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পার্টির একটি "সাময়িকসাংগঠটিক কমিটি" গঠিত হয়ে ছিল। কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহার ইউনিটটি সরাসরি এই সাংগঠনিক কমিটির সাথে জড়িত ছিল। পাটি সার্কুলার তথা পার্টির বর্তমান রাজনৈতিক লাইনের সাথে মোহাম্মদ তোয়াহা দ্বিমত পোষণ করে নেতাদের জানিয়ে দিলেন, "পার্টির নতুন বক্তেব্যের তত্ত্বগত সঠিক প্রশ্ন বাদ দিলেও সার্কুলারের নির্দেশিত কার্যক্রম–সিলেট জেলার পাকিস্তানে যোগদানের বিরোধিতা করা বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।" তিনি গণভোটের কাজে সিলেটে না গিয়ে তাঁর নোয়াখালী গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন।

মোহাম্মদ তোয়াহার দেখাদেখি অলি আহাদ, আজাদ সুলতান ও অন্যান্য মুসলমান কর্মীরা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রেখে পার্টিতে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু পার্টির ভারত ঘেঁষা নীতিতে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করে পার্টি ত্যাগ করেন। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী প্রচার আন্দোলন সত্ত্বেও সিলেটবাসী পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিলেন এবং এখানে পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

তেলেঙ্গানা সংগ্রাম

হায়দারাবাদের প্রধানমন্ত্রী কাশেম রাজা সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীকে সুসংগঠিতভাবে গড়ে তোলেন। এই সামন্ত রাজা রাজাকার বাহিনীর সাহয্যে দেশের কৃষক প্রজাদের উপর দমন-পীড়ন চালাতে থাকেন। নির্যাতীত কৃষকরা রাজার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে শুরু করে। ১৯৪৫-৪৬ সালের কৃষক-জনতার সংগঠিত শক্তির সামনে এসে দাঁড়ায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক শাখা কমিটি। ১৯৪৫ সালে শেষ দিকে তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামের কাহিনী বোম্বে থেকে প্রকাশিক পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র "পিপলস ওয়ার" পত্রিকায় এবং কলকাতা থেকে "জনযুদ্ধ" পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে। কৃষকদের এই সংগ্রাম তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র রূপ গ্রহণ করে অনেক অঞ্চল কমিউনিস্ট গেরিলাদের দখলে চলে যায়। পার্টির নির্দেশে হায়দারাবাদের পার্শ্ববর্তী মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশের পার্টি কমিটি তেলেঙ্গানার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে পাটিশন কাউন্সিল দেশীয় (সামন্ত) রাজ্যগুলোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিল এবং এই নির্দেশে বলা হলো— তাঁরা (এই রাজ্যগুলো) ইচ্ছা করলে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারবে। হায়দারাবাদের নিজাম, তাঁর রাজ্যকে কোনো দেশের সাথে যোগ না দিয়ে স্বাধীনভাবে থাকার কথা ঘোষণা করলেন। এসময় কমরেড অমৃত পাদডাঙ্গের নেতৃত্বে একটি কমিউনিস্ট প্রতিনিধি দল, মি. নেহেরুর সাথে দেখা করে তাঁকে জানান যে, হায়দারাবাদের নিয়ামের জুলুমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তেলেঙ্গানার জনগণ অস্ত্র হাতে নিয়েছে, কিন্তু নেহেরু সরকারের প্রতি তাঁরা অনুগত আছে। কংগ্রেস নেতা এই সুযোগ হাত ছাড়া করল না। তিনি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন "পুলিশ একশন" করে হায়দারাবাদ দখল করে লও। ভারতীয় সেনাবাহিণীর প্রথম আক্রমনেই নিয়ামের রাজাকার বাহিনীর পতন ঘটল, কিন্তু কমিউনিস্ট বাহিনী তাঁদের মুক্ত অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করল। অনেক খণ্ড-বিক্ষণ্ড যুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনী কমিউনিস্ট বাহিনীকে পরাজিত করল। অবশিষ্ট কমরেডরা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেও তাঁরা নিচিহ্ন হয়ে গেল। পার্টির নেতাদের বিশ্বাসঘাতকরা মীর জাফরকেও ছাড়িয়ে গেল।

কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতা

ভারতসহ সারা বিশ্বে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তখন ভারতের কমিউবিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তানুসারে আওয়াজ তোলে—"কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট পাটি এক হও" নেহেরুজী ভাবিয়া দেখুন" ইত্যাদি। ব্যারিষ্টারগণ নিজেরদের শ্রেণীর স্বার্থের কথায় ভাবলেন। কেননা ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল— ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক ছাত্র মধ্যবিত্ত ও মহিলাদের বিরাট বিরাট মিছিল তথা গণআন্দোলন চরমে, শহরেরর রাস্তায় রাস্তায় চলছে সশস্ত্র খণ্ড যুদ্ধ এবং নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীতে শুরু হয়েছে বিদ্রোহ।

তখন বুর্জেয়া–জননেতারা সরকারের সাথে আপোষ করে চলছেন। আর সরকার চরম নিপীড়ন চালায়ে এইসব আন্দোলন, বিদ্রোহ দমন করছে। অপর দিকে কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে যখন ব্রিটিশ বিরোধী পাল্টা সরকার গঠন শুরু হয়েছে, তখনও পার্টি নেতারা স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। ফলে পার্টির বহু কর্মী শহীদ হলো এবং ভারত ভাগ হয়ে ব্রিটিশের দুটি নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠিত হলো, এই নয়া উপনিবেশ দুটির তত্ত্বাবাধক হলেন—ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারী—বড় লাট লর্ড মাউন্ট বেটন এবং গভর্ণর জেনারেল হলেন— ব্যারিস্টার গান্ধী ও ব্যারিস্টার জিন্নাহ। উভয়

www.pathagar.com

দেশেই সরকার গঠিত হলো—বুর্জেয়া বুদ্ধিজীবী ও নবাব-জামিদারদের সমন্বয়ে। তাই দেশ দুটির আভ্যন্তরীণ চরিত্র দাঁড়াল—আধা–সামন্তবাদী ও আধা–পুঁজিবাদী।

পাক আমল

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট রাত ১২ টায় পাকিস্তান এবং ১২টায় এক মিনিটে ভারতের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হলো। কিন্তু এসময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেম চোখের রোগে ভুগে প্রায় অন্ধ হয়ে যান এবং অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোরওয়ার্দীও ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের মালামালের তদারকিতে কলকাতায় কাজে ব্যস্ত থাকলেন। এই সুযোগে মুসলিম লীগের ক্ষুদ্র একটি গ্রুপ নবাব নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা তথা পুর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখন করে বসলেন। ফলে মুসলিম লীগের পূর্ব বালার প্রভাবশালী যুব নেতারা অর্থাৎ 'ঢাকা গ্রুপ' নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েন।

যদিও মোহাম্মাদ তোয়াহা ও তসাদ্দুক আহম্মদ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে গোপনে সরাসরি জড়িত ছিলেন, তবুও এই যুব নেতারা নাজিমুদ্দিনের আওতামুক্ত স্বতন্ত্রভাবে একটা কিছু করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। এই চিন্তার বহিপ্রকাশ হলো– 'ডেমোক্র্যাটিক ইয়থ লীগ' (তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রভাব ছিল বেশি) ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর একটি যুব সম্মেলনে গঠিত হলো ডেমোক্র্যাটিক ইয়থ লীগ বা গণতান্ত্রিক যুব লীগ। এই যুব লীগের নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, তসাদ্দুক আহম্মদ, অলি আহাদ, কামরুদ্দিন আহম্মদ ও তাজউদ্দিন আহম্মদ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম বাংলা থেকে হাশেম-সোরওয়ার্দী গ্রুপের যাঁরা পূর্ব বাংলায় আসলেন, তাঁরা মূলনেতাদের অবর্তমানে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা করলেন। এখানে বলা ভালো যে, জনাব আবুল হাশেম সাহেব শেষ বয়সে ধর্মীয় দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলে তাঁর গ্রুপ, দুটি উপ–শাখায় ভাগ হয়ে পড়ে। প্রথম শাখাটি হাশেম সাহেব" রবুবিয়াত রব্বানিয়াত" –এর চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হয়ে নভেম্বরে গঠন করেন "তমদ্দুন মজলিস"। 'তমদ্দুন মজলিস' -এর মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানে ইসলামী সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই শাখার নেতৃত্ব দেন– অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবুল কাশেম, আব্দুল গফুর ও ছানাউল্লা নূরী। মোহাম্মদ তোয়াহা ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে তমদ্দুন মজলিসের সদস্য পদ দেওয়া হলেও তাঁরা এ সংগঠনে যোগদান করেন নাই।

পরে অপর শাখা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীরা মোহাম্মদ তোয়াহা এডভোকেট কামরুদ্দিন আহম্মদ, তাজউদ্দিন আহম্মদ ও অলি আহাদের নেতৃত্বে গঠিত হলো "গণ আজাদী লীগ"। গণ আজাদী লীগের উদ্দেশ্য ছিল— স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র গঠন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লীগের প্রগতিশীল ঢাকা গ্রুপ সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং ছাত্রদের মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। এই ছাত্র সংগঠনটি গড়ার জন্য অলি আহাদ ও নইমুদ্দিন, ছাত্র নেতা তোয়াহার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ফজলুল হক মুসলিম হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভি. পি.) মোহাম্মাদ তোয়াহা এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভি. পি.) সৈয়দ নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগায়ে, ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নেতাদের একত্র করা হলো ফজলুল হক মুসলিম হলের মিলনায়তনে। মোহাম্মদ তোয়াহার সভাপতিত্বে এই ছাত্র সম্মেলনের সিদ্ধান্তে ইষ্ট পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্ড লীগ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ) এর সাংগঠনিক কমিটি। এই সাংগঠনিক কমিটির যুগ্মআহ্বায়ক হলেন–অলি আহাদ ও নঈমউদ্দিন।

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাককালে নব্য দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষাকে কেন্দ্র করে পত্র পত্রিকায় (জুলাই থেকে) অনেক লেখালেখি হয়। পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসী বাংলা ভাষা ভাষী ছিল, তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ড. মো. শহীদুল্লাহ, ড. মু. এনামুল হক, ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ কলম ধরেন। বিপরীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নেতারা অধিকাংশ উর্দু ভাষী থাকাতে তাঁরা রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ পক্ষে ছিলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন, 'আজাদ' পত্রিকার মালিক মো. আকরাম খাঁন, কবি গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক মুজিবর রহমান খাঁন, সাংবাদিক ওয়াজেদ আলী প্রমুখ।

২৭শে নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন। এই সম্মেলনে সুপারিশ করা হয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু। ফলে ৫ই ডিসেম্বরে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে ঢাকার ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীরা এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ৬ ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘঠিত হয় এক ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের ছাপানো টাকায়, পোষ্টকার্ডে, খামে, ডাকটিকিটে, মানি অর্ডার ফরমে, রেল টিকিটে ইত্যাদি ইংরেজি ও উর্দু ভাষা ব্যবহার করার প্রতিবাদে পলাশী ও নীলক্ষেতে অবস্থিত তৎকালীন সরকারি কর্মচারীদের আশ্রয়স্থলেও অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীরাও ছাত্রবুদ্ধিজীবীদের সাথে সরকার অনুসৃত (ভাষা) নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটি 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত হলেও, পাকিস্তানের সরকারি কাজে অর্থাৎ অফিস আদালতে শুধুমাত্র উর্দু প্রচলনে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তাই এই সংগঠনের নেতারা সরকারি কাজে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি তোলেন। এতে পূর্ব পাকিস্থানের উর্দুভাষী মূখ্যমন্ত্রী নবাব স্যার নাজিমুদ্দিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং এই দাবিকে ধ্বংস করতে তিনি ঢাকার আদিবাসীদের লেলিয়ে দেন। প্রকাশ তাকে যে, তখন ছোট ঢাকা শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই উর্দু ভাষায়

www.pathagar.com

কথা বলতেন। নবাব সাহেবের নির্দেশ পেয়ে ১২ই ডিসেম্বর ঢাকাইয়ারা সশস্ত্রভাবে তমদ্দুন মজলিসের নাজিমদ্দিন রোডস্থ অফিস ভেঙে—চুরে ধ্বংস করল; আক্রান্ত ও ধ্বংস হলো প্রেকৌশল কলেজ। বাস্তব পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে মজলিস নেতারা ছাত্র নেতা মোহাম্মদ তোহয়াহার সাহায্য কামনা করলেন। তোয়াহা সাহেব নিজের হলে তাঁদের অফিসকে সাময়িকভাবে স্থানন্তরিত করার পরমর্শ দিলেন। তিনি মজলিস নেতাদের বুঝতে সমর্থ হন যে ভাষার প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ না করলে ব্যাপক জনগণের সাড়া পাওয়া যাবে না এবং তাঁর সংগঠন গণ আজাদী লীগ" সে দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিল। অতঃপর ডিসেম্বরের শেষ দিকে গণ আজাদী লীগের এবং তমদ্দুন মজলিস-এর নেতৃত্বে গঠিত হলো "রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ" এই পরিষদের সম্পাদকর দায়িত্ব দেওয়া হলো, মজলিস কর্মী নুরুল হক ভূঁঞাকে এবং বিশ্ব বিদ্যালয় শাখার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো ছাত্র নেতা আব্দুল মতিন (পাবনা)-এর উপর।পরে কমরেড মতিন" রাষ্টভাষা মতিন" নামে ভার্সিটিতে পরিচিতি লাভ করেন। এই সময়ের প্রতিটি সরকার বিরোধী রাজনৈতিক প্রচার পত্র মোহাম্মদ তোয়াহার লিখিত এবং বিভিন্ন সংগঠন বা নেতার নামে তা প্রচার করা হতো। ঢাকাবাসীদের নিরস্ত্র করার জন্য এই সময় সংগ্রাম পরিষদ শ্লোগান তোলে, "উর্দু বাংলা ভাই ভাই, উর্দুর সাথে বাংলা চাই"। এই শ্লোগানকে জনপ্রিয় করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নঈম উদ্দিন, তাজউদ্দিন ও আ. মতিনের কর্মকাণ্ড ছিল প্রধান।

১৯৪৮ সালে জানুয়ারি মাসে 'ঢাকা গ্রুপ ও কলকাতা থেকে আগত (হাশেম সোরওয়াদী গ্রুপেরর) যুব নেতারা যৌথভাবে ঢাকাতে একটি পার্টি কর্মীদের সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনটি "ওয়ার্কার্স ক্যাম্প" নামে আখ্যায়িত করা হয়। খাজা নাজিমুদ্দিনের স্বেচ্চারমূলক কর্মকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা গ্রুপের মোহাম্মদ তোয়াহ ও কলকাতা গ্রুপের শেখ মুজিবর রহমান এই সম্মেলন সংঘটিত করেন। এই ওয়ার্কস ক্যাম্প, শাসিত মুসলিম লীগের বিপক্ষে জনগনকে সংগঠিত করতে প্রচেষ্ঠা লয়।

কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস

১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাঝে মাঝে কমিউনিস্ট পার্টি নেতারা বৈঠক করেন এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ দিন ধরে কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে কমরেড পি. সি. যোশীর থিসিস –বুর্জোয়া পার্টিকে সহযোগীতার লাইন বর্জন করা হয়। এই থিসিস অনুসারে পার্টি শ্লোগান তুলে ছিল "লীগ-কংগ্রসে -কমিউনিস্ট পার্টি– এক হও "ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ধারনা গড়ে উঠে ছিল," রুটি রুজিকা লিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি, আজাদীকা লিয়ে কংগ্রেস" (খাদ্যের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি-স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস)।

www.pathagar.com

কংগ্রেসে বুর্জেয়া পার্টির লেজুর বৃত্তি বাদ দিয়ে তার স্থলে কমরেড বি. টি. রনদিভের থিসিস" জট পাকানো দুই বিপ্লব" [(১) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (২) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব– জটপাকিয়ে গেছে] গৃহীত হয়। গৃহীত এই থিসিসে বলা হয়" বিপ্লব সংগঠিত করার সময় এসে গেছে.... সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া নেতৃত্ব উৎখাত করতে হবে" কমরেড রণদিভ পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এসালেই গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার' সভাপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডক শ্রমিক নেতা আলতাফ আলী এবং সাধারণ সম্পাদক : খিদ্দির পুরের (কলকাতার) শ্রমিকনেতা এডভোকেট ফয়েজ আহম্মদ।

এই কংগ্রেসে পাকিস্তানে বসবাসরত পার্টি সদস্যাদের নিয়ে নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টির 'পাকিস্তান শাখা' গঠনের অপর এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই ৬ই মার্চ কলিকাতায় পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে, পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। এই পুনগঠিত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন—যুক্তপ্রদেশের বাসিন্দা কমরেড সাজ্জাদ জহীর, পশ্চিম বাংলার বাসিন্দা কমরেড ব্যারিস্টার আ. লতিফ ও কমরেড আবুল মনসুর হাবিব উল্লাহ এবং পশ্চিম বাংলায় কর্মরত কমরেড মনি সিং ও কমরেড খোকা রায়। কমরেড সিং ও খোকা রায় ময়মনসিংহের বাসিন্দা হওয়াতে তাঁরা দুজনে এখানে রয়ে যান, কিন্তু বাকি ঐ তিন কমরেড পারিবারিক কারণে ফের ভারতে ফিরে যান। ফলে পাকিস্থান কমিউনিস্ট পার্টি জনগনের মধ্যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। তাই পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটি বা অস্থায়ী প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হলো এবং এই কমিটির সম্পাদক হলেন কমরেড খোকা রায়।

এখানে বলা উচিত যে কমিউনিস্ট পার্টি হলো শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। তাই শ্রমিক নেতারাই পার্টির নেতৃত্বে থাকা উচিৎ। তখন পূর্ব বাংলার নামকরা শ্রমিক নেতারা ছিলেন কমরেড ফয়েজ আহম্মদ, আলতাফ আলী, অনীল মুখার্জী, রওশন আলী ও নেপালনাগ। এদের মধ্যে কমরেড নেপাল নাগ ছিলেন সবচেয়ে বেশি খ্যাত শ্রমিক নেতা। কিন্তু কমরেড খোকা রায় ময়মনসিংহের লোক হলেও তাঁর কর্মস্থল ছিল কলকাতার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। কমরেড মনি সিং ও কমরেড নগেন সরকার ১৯৪২ সাল থেকে ময়মনসিং কিশোর গঞ্জ এলাকায় কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন। নগেন সরকার অধিকাংশ সময়েই জেলে বন্দি থাকেন এবং মনি সিং কলকাতার শ্রমিকদের মধ্যে কাজে বস্ত্য ছিলেন। এই অবস্থায় পূর্ব বাংলার শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অপরিচিত খোকারায়ের নেতৃত্ব বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাই পরে কমরেড মনি সিংহের উপর পার্টির নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলেও পাটিতে মন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

যাই হোক ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে যাঁরা নেতৃত্ব করছিলেন, তাঁরা হলেন— কমরেড খোকা রায়, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, মনি সিং, মনসুর হাবিব, নেপাল নাগ, আলতাফ আলী, নিরঞ্জন গুপ্ত, বারিণ দত্ত, মারুফ হোসেন, ইয়াকুব মিঞা, আব্দুল কাদের চৌধুরী, সুবীর চৌধুরী, বিভূতি গুহ, প্রমথ ভৌমিক, অবনি বাগচী, পূর্নেন্দু দস্তিদার, মুকুল সেন, অমূল্য লাহিড়ী প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে মি. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ইংরেজি ও উর্দুর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা করার দাবি করে এবং সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন, পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্যার নবাব খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ অবাঙালি সংসদ সদস্যদের ভোটে তা বাতিল হয়ে যায়। ফলে ২৬শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' তাদের সপক্ষে জনমত গড়ার জন্য ১১ই মার্চ, "রাষ্ট্র ভাষা দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই দিনের কর্মসূচি ছিল, (১) রাজধানীতে হরতাল পালন, (২) অফিস আদালতে কর্মবিরতি, (৩) মুখ্যামন্ত্রীর কাছে স্মারক লিপি পেশ। এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য একটি শক্তিমালী সংগ্রাম কমিটি গঠনের প্রয়োজন হয়। ফলে ২রা মার্চ ফজলুক হক হলে, বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের কর্মীদের নিয়ে দ্বিতীয় বার 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদে —গণ আজাদী লীগ; যুব লীগ, তমদ্দুন মজলিশ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসের প্রতিনিধিরা স্থান পায়। পরিষদের আহবায়ক করা হয়— তমদ্দুন মজলিশের সামছুল আলমকে এবং সদস্য মনোনীত হন—কামরুদ্দিন আহমেদ, মো. তোয়াহা, অলী আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ।

পরিষদ নেতারা মিছিল সহকারে ইডেন বিল্ডিং-এর ২নম্বর গেটে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিতে গেলে, পুলিশ লাঠি চার্জ শুরু করে। ঐ ঘটনা সম্বন্ধে মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন যে, লাঠি চার্জের প্রথমেই তিনি পুলিশের মার খেয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং এই সাথে একদল পুলিশের যৌথ মারের স্বীকার হন। এই সময় তিনি একজন অবাঙালি পুলিশের কথা শুনতে পান— 'একজনকে তোমরা এত জনে মারছে কেন?' এর পরেই সিটি এস. পি. গফুর সাহেব এসে হাতের রুলের বাড়ি দিয়ে পুলিশ দলকে ভেঙে দেন এবং তাঁকে মাটি থেকে তুলে গেটের একটি টুলের উপর বসায়ে দেন। এরপর সিটি

www.pathagar.com

এস. পি. ছোটেন মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করতে। এদিকে ঢাকার এস. পি. ওবায়েদ উল্লাহ এসে তোয়াহা সাহেবকে গ্রেফতার করে সচিবালয়ের মধ্যে নিয়ে যান। এই গ্রেফতারের খবর প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই ছাত্র জনতার মারমুখী মিছিল সচিবালয়ের দিকে এগিয়ে আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন এবং সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে বৈঠকের প্রস্তাব দেন। অতঃপর আহত তোয়াহাকে ছাত্ররা হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেন। গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলেন শামসুল হক, শেখ মুজিব কাজী গোলাম মাহবুব, আলী আজগর, জসিমদ্দিন, ফরিদুল হুদা প্রমুখ। ১৩ই মার্চ ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।

পরদিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বর্ধমান হাউজ (বর্তমানে বাংলা একাডেমী) এই সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় ছাত্রনেতারা জানতে পারেন— 'রাষ্টভাষা' প্রশ্নটি প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ার ভুক্ত নয়। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে মাত্র। সুতরাং আলোচনা শেষে মূল চারটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং সরকার ও ছাত্র নেতারা (উভয় পক্ষ) এই সিদ্ধান্ত মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সিদ্ধান্তগুলো হলো—

(১) পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক আইন পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ করাবেন যাতে কেন্দ্রীয় গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যদা দিয়ে সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (২) ভাষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজবন্দিদের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। (৩) হরতালের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে যে-সব সরকারি কর্মচারী কাজে যোগদান করতে পারেনি তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। (৪) আন্দোলনের দিনগুলিতে হরতাল চলাকালিন সময়ে পুলিশের জুলুমের তদন্ত করতে হবে এবং অন্যায়কারীদের শাস্তি বিধান করতে হবে।

এদিকে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য ডেপুটি স্পীকার তোফাজ্জাল আলী অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, শ্রমিকনেতা ডা. আব্দুল মোত্তালিব মালিক, হাশেম-সোহরওয়ার্দী মন্ত্রী ছিলেন, তাঁরা নব গঠিত নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি। তাই তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা লাভের জন্য মোহাম্মদ তোহয়াহাকে ডেকে পাঠান এবং ঘরোয়া আলোচনায় তাঁকে ভাষাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পরামর্শে দেন। তোয়াহা সাহেব তাঁদের সাহায্য চাইলে তাঁরা বলেন যে, তুমি আমাদের লোক, তুমি ছাত্রদের ক্ষেপালে কায়েদে আযম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে আমাদের মন্ত্রী–রাষ্ট্রদূত বানাবে। তখন তোমাকে আমরা সাহায্য করতে পারব। তোয়াহা সাহেব যেহেতু মুসলিম লীগ ত্যাগ করে তাঁর মূল পার্টির নির্দেশেই কাজ করছিলেন, সেহেতু তিনি কারও মন্ত্রী হওয়ার জন্য ছাত্র রাজনীতি করবেন না বলে জানিয়ে দেন। এই নেতারা নিৎসাহ হয়ে শেখ মুজিবের সাহায্যে গোপন ষড়যন্ত্রে নেমে পড়েন।

www.pathagar.com

ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনকে বাঁচায়ে রাখতে প্রত্যহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শেষে বেলতলায় সামাবেত হয়ে আন্দোলন সম্বন্ধে ঘরোয়া সভায় মিলিত হতেন এবং প্রত্যহ সভায় সভাপতিত্ব করতেন মো. তোয়াহা। হঠাৎ ১৬ই মার্চ বেলতলায় শেখ মুজিবর রহমান একটা ভাঙা চেয়ারে বসে থাকেন এবং ছাত্রদের জমায়েত সাথে সাথেই স্বঘোষিত সভাপতি হয়ে অন্যদের কিছু বলার আগেই তিনি বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি উত্তেজনামূলক বক্তৃতায় বলেন যে, এখন প্রাদেশিক সংসদে অধিবেশন চলছে, সুতরাং এখনই আমরা সংসদ ভবন ঘেরাও করে আমাদের দাবি আদায় করব। এই বক্তেব্যের সাথে সাথেই তিনি নিজে সর্বাগ্রে গেটের দিকে ছুটে যান এবং তাঁর সাথে উৎসাহী ছাত্ররাও মিছিলে এগিয়ে যান। মোহাম্মদ তোয়াহা ও অন্যান্য ছাত্রনেতারাও মিছিলে শরীক হন। কিন্তু সংসদ ভবনের চত্তরে শেখ মুজিবকে আর দেখা যায় নি। তবে হঠাৎ ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রশ্ন উঠে মোহাম্মদ তোয়াহা কোথায়? সে মূখ্যমন্ত্রীর সাথে কী চুক্তি করেছেন তা আমরা এখনই জানতে চাই।

এই ঘোষনার পরই কিছু উৎসাহি ছাত্র মোহাম্মদ তোয়াহাকে কাঁধে করে সংসদ ভবনের বারান্দয় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। মোহাম্মদ তোয়াহা অবস্থা বেগতিক দেখে এই ঘেরাও পরিবেশে তিনি চুক্তির কথা অস্বীকার করে বলেন যে, মূখ্যমন্ত্রীর সাথে তাঁর কোন চুক্তি হয়নি এবং তিনি এখনই দাবি আদায় করে নেবেন। এই ঘোষণার ফলে ছাত্র জনতা "তোয়াহা ভাই– জিন্দাবাদ"ধ্বনি দিতে থাকেন।

অপর দিকে মূখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন হঠাৎ ছাত্রদের ঘেরাও দেখে ভয় পেয়ে যান। তাই তিনি তখনই ক্যান্টনমেন্টে ফোন করে সেনাবাহিনীর সাহায্য চান। ফোন পেয়েই পূর্ব পাকিস্তানের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল আয়ুব খাঁন সংসদ ভবনে ছুটে আসেন। গোলযোগ এড়াবার জন্য তিনি গোপন পথে মূখ্যমন্ত্রীকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন এবং ছাত্রদের সামনে ঘোষণা করেন, "চিড়িয়া উড় গিয়া" (পাখী উড়ে গেছে)। সুতরাং অগত্য ছাত্ররা ঘেরাও তুলে নিয়ে হলে ফিরে যান। এখানে প্রকাশ থাকে যে, এই ঘটনার পর শেখ মুজিবকে আর কখনো ছাত্র সমাবেশ বা মিছিলে দেখা যায়নি। তিনি ১৯৪৯ সালে গ্রেফতার হয়ে ১৯৫২ সালে মাঝামাঝি পর্যন্ত কারাগারে বন্দি ছিলেন।

পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ২১শে মার্চ রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সাথে এক বৈঠকে বসেন। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহা ও জননেতা সামছুল হকের সাথে জিন্নাহ সাহেবের অনেক কথা কাটাকাটির মধ্যেই শেষ হয়। তিনি ২৪শে মার্চ কার্জন হলের সমবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।" সাথে সাথেই ছাত্রনেতা আব্দুল মতীন ও তারসঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করেন এবং পরে সমস্ত হল ঘরটি প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

জিন্নাহ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিলে ডাকসুর ভি. পি. অরবিন্দ বোস, ডাকসুর জি. এস. গোলাম আযম, এস. এম. হলের ভি. পি. সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ফজলুল হক হলের ভি. পি. মোঃ তোয়াহা বেইলী রোডের গণভবনে বৈঠকে মিলিত হন। প্রকাশ থাকে যে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি আবাসিক ছাত্র হল ছিল। এর মধ্যে ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল দুটি ছিল অমুসলিম ছাত্রদের জন্য এবং চামেলি হাউজটি ছিল ছাত্রীদের অস্থায়ী ছাত্রীবাস। তাই তাঁরা ঐ চারটি হলের মধ্যমেই লেখাপড়া করতেন। যাই হোক, জিন্নাহ সাহেব শুধুমাত্র মুসলিম হল দুটির ছাত্র নেতাদের সাথে বৈঠকে বসতে রাজী হন। এ ছাড়া ডাকসুর সহ-সভাপতি হিন্দু থাকাতে তিনি প্রস্তাব দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্র নেতাদের সাথে তিনি বৈঠকে বসবেন। এর প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহ ও সহকারী হিসেবে নঈম উদ্দিন এবং নিখিল পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান ও সহকারী মজহারুল কুদ্দুস যৌথভাবে পর পর তিনটি সভায় এবং পৃথকভাবে আরও কয়েকটি বৈঠকে মি. জিন্নাহের সাথে মিলিত হন।

এইসব বৈঠকের জিন্নাহ সাহেব জানতে পারেন যে, শাহ আজিজের ছাত্র সংগঠনের অনেক নেতারই সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। তাই তিনি শাহ সাহেবকে মোহাম্মদ তোয়াহার ছাত্র সংঘঠনে যোগ দিয়ে মুসলিম ছাত্রদের একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পরামর্শ দেন। অবশ্য নাজিমুদ্দিনের জন্য পরে এই পরামর্শ কার্যকরী হয়নি। কায়েদে আযম রাজধানীতে ফেরার আগে শহীদ গ্রুপের নেতৃত্বকারী ত্রিনেতা-তোফাজ্জাল আলী , ডা. আব্দুল মোত্তালিব মালিককে, খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার সদস্য এবং মো. আলী চৌধুরীকে বার্মায় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দিয়ে যান। ফলে ভাষা আন্দোলন ও বিরোধী দলের সকল আন্দোলন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে।

এসময় গান্ধীজী কংগ্রেস নেতাদের পাকিস্তানের পাওয়া টাকা পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। ফলে তিনি আমরন অনশন পালনের কথা ঘোষণা করেন। উগ্র হিন্দু নেতারা গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এই প্রেক্ষিতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক-নাথুরাম গডসে ক্ষিপ্ত হয়ে রিভালবারের গুলীতে গান্ধীজীকে খুন করেন। এই মৃত্যু প্রতিক্রিয়াই ভারতের সর্বত্রই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের শান্তি পরিবেশ দেখে শহীদ সোরওয়ার্দী স্টিমার যোগে ঢাকাতে বসবাসের জন্য চলে আসেন। তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে নাজিম উদ্দিন-নূরুল আমিনের টনক নড়ে। তাঁরা ক্ষমতা হারাবার ভয়ে অবিভক্ত বাংলার এই প্রধানমন্ত্রীকে পুলিশ দ্বারা ঘেরাও করে ফের কলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করেন। শহীদ সাহেব কলকাতায় ফিরে যেয়ে কিছু দিন অবস্থানের পর করাচিতে চলে যান।

www.pathagar.com

কায়েদ আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ১১ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু হলে সেপ্টেম্বর মাসে খাজা নাজিমুদ্দিন, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলের পদটি দখল করেন এবং তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন নূরুল আমীন।

হঠকারীতা

কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক লাইন (কমরেড রণদিভের থিসিস) 'সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া নেতৃত্ব উৎখাত করতে হবে কার্যকর করতে চেষ্টা চালায়। ফলে তিন মাইল প্রশস্ত ও পঞ্চশ মাইল দীর্ঘ হাজং অঞ্চলে 'সশস্ত্র হাজং বিদ্রোহ' শুরু হয়। এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানাতে পার্টি নিয়ন্ত্রিত কৃষক অঞ্চলেও বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু সদ্য 'স্বাধীনতা' প্রাপ্ত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ এই আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি। তাই আন্দোলনে পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই সময় পার্টিতে দাবি উঠল—নেতৃত্বে শ্রেণী চরিত্র সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই শ্রমিক নেতা কুষ্টিয়ার রওশন আলী ও কৃষক নেতা যশোরের হেমন্ত সরকার প্রমুখ শ্রমিক-কৃষক নেতা নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি পুনগঠিত করা হয়। কিন্তু এইসব নেতারা মার্কসবাদী তত্ত্বজ্ঞান ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারেননি, তাই ঐ নেতাদের সাথে একজন করে বুদ্ধিজীবী কমরেড পরামর্শের জন্য নিয়োজিত করা হলো। এই হঠকারী কর্মকাণ্ডের সময় ছেলেমানুষী নেতৃত্বে পার্টি জনসমর্থন হারায় এবং সরকারি নিপীড়নে পার্টি ধ্বংসের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ভারতীয় সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করলেও পাকিস্তান সরকার তা কনেনি। কিন্তু পার্টির এই হঠকারী কর্মকাণ্ডে সরকার প্রায় ১৭০০ পার্টি কর্মীকে জেলে বন্দি করে পরোক্ষভাবে পার্টির কাজ বন্ধ করে দেয়। শ্রমিক নেতারা অধিকাংশই জেলে বন্দি হওয়াতে পার্টির শ্রমিক ফ্রন্ট ভেঙে পড়ে। তাই মোহাম্মদ তোয়াহাকে নারায়ণ গঞ্জের শ্রমিক ফ্রন্টকে বাঁচায়ে রাখতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি শহীদুল্লাহ কায়সার, আনোয়ার করিমসহ একটি বুদ্ধিজীবী গ্রুপ নিয়ে ঢাকেশ্বরী মিলে পৌছালে, মিল ম্যানেজার ডাকাত বলে তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অনেক দিন দরবারের পর তাঁরা গ্রেফতার থেকে মুক্তি পান।

এদিকে পার্টি কমরেডদের আশ্রায়দানের জন্য পাটি, কমরেড তোয়াহাকে হল ছেড়ে দিয়ে বাসা ভাড়া করার নির্দেশ দেয়। মোহাম্মাদ তোয়াহা ঘর ভাড়া করে গ্রামের বাড়ি থেকে গর্ভবতী স্ত্রী শিউলী ও দেড় বছরের মেয়ে সাহানা চিনুকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এই ভাড়ার বাড়িতে স্ত্রী কন্যাসহ পাটি কমরেডরা অবস্থান করছিলেন; আর মোহাম্মাদ তোয়াহা

www.pathagar.com

ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সাহায্য করার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে ব্যস্ত। এদিকে শিউলী তোয়াহা অসুস্থ্য হয়ে পড়লে পার্টির সমর্থক ও তোয়াহা সাহেবের বন্ধু ডা. আব্দুল করীম (কিশোর ফার্মেসীর মালিক) তাঁকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। তিন দিন পরে তোয়াহা সাহেব পুত্র সন্তানসহ স্ত্রীকে বাসায় নিয়ে আসেন। সদ্যজাত পুত্রসন্তানসহ স্ত্রীকে বাসায় রেখে তোয়াহা সাহেব ফের বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের কাজে ব্যবস্ত রইলেন। বেগম তোয়াহা ফের জ্বরে পড়েন, কিন্তু তোহয়াহা সাহেবের উপর পুলিশের নজর থাকাতে তিনি অসুস্থ্য স্ত্রীকে দেখেই ফের গা ঢাকা দেন। পরে খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল ইউনিটের পার্টি-কর্মী ফরিদপুরের আব্দুল হাই (সাবাশ হাই) ও তাঁর সহপাঠি কিশোর গঞ্জের ডা. ফজলুল করীম এসে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। বেগম তোয়াহা সেখানে পনের দিন সজ্ঞাহীন থাকার পর জ্ঞান ফিরে পান। কিন্তু তাঁর স্মৃতি ভ্রম ঘটল। ফলে তিনি সেখানে আরও দেড়মাস থাকার পর মোহাম্মদ তোয়াহ হুলিয়া মুক্ত হয়ে স্ত্রীকে বাসায় নিয়ে আসেন। এর পর বাসায় থেকেই অর্ধপাগল স্ত্রীকে তিনি চিকিৎসা করান।

আওয়ামী মুসলিম লীগ

ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের পক্ষ থেকে সামছুল হক, খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ ও শেখ মুজিবর রহমানের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের ২৩শে ও ২৪শে জুন, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাক্তান সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকার গোপীবাগে হুমায়ুন সাহেবের বাড়ি " গোলাপ বাগ" (Rose garder); বর্তমানে বেঙ্গল স্টুডিও-এ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক সম্মেলনে সভাপতি -মৌলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক- সামছুল হক, যুগ্ম সম্পাদক— শেখ মুজিবর রহমান ও খন্দকার মোস্তাক আহম্মদসহ চল্লিশ সদস্যের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

মনি সিং ও খোকা রায়, কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহার ইউনিটকে এই দলে যোগদান করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি সদলবলে এই প্রস্তাব নাকাচ করে পার্টি নেতাদের অন্য একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিকদল গঠনের জন্য চাপ দেন। এসময় বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার পুলিশবাহিনী ধর্মঘট শুরু করে।

কমরেড তোয়াহার বাড়িতে এত অচেনা লোকজন যাতায়েত প্রতিবেশরা সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। তাই তিনি ৫ই নভেম্বর বাসা বদল করে ৪৩/১ যুগীনগরের হিন্দু মহল্লায় উঠে আসেন। মোহাম্মদ তোয়াহার পিতা হাজী ইয়াসিন সাহেব ছিলেন নোয়াখালীর বিত্তশালী ব্যক্তি। তাঁর ছেলে পরের বাসায় ভাড়া থাকে, এত তিনি পছন্দ করেন নাই। তাই

www.pathagar.com

তিনি পুত্রকে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি বাড়ি কেনার হুকুম দিলেন। তোয়াহা সাহেব ঐ টাকাটা মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে জমা রেখে দিলেন এবং আর্টির কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাসা কেনার জন্য বাড়ি দেখবেন এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু বাড়িতে পার্টি-কমরেডদের আশ্রায় স্থল (শেল্টার) ছিল এবং তিনি ঐ নেতা-কর্মীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেই কিছু দিনের মধ্যে ঐ টাকাটা খরচ করে ফেললেন।

একদিন হঠাৎ হাজী সাহেব অসুস্থ্য হয়ে ঢাকায় ছেলের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর ছেলে তোয়াহা হুলিয়া মাথায় করে আত্মগোপন করে আছেন। পার্টি দরদীরা হাজী সাহেবকে ঢাকা মেডিক্যাল কালেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিলেন। ডাক্তারগণ জানালের তাঁর ক্যান্সার হয়েছে। ১৯৫০ সালের ৯ই জৈষ্ঠ্যের সকাল সাড়ে আটটায় হাজী সাহেব হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তোয়াহা সাহেবের বন্ধুরা তাঁকে আজিমপুর গোরস্তানে কবর দিলেন। পুলিশের ভয়ে তিনি পিতার মৃতু মুখও দেখতে পারলেন না। এ সময় পার্টির কড়া নির্দেশ ছিল— কোনো প্রকারেই কমরেড তোয়াহাকে পুলিশের কাছে ধরা দেওয়া চলবে না; তা হলে পার্টির কাজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পার্টির নির্দেশে তিনি স্ত্রী কন্যা-পুত্র থেকে দূরে গোপনজীবন যাপন করছিলেন এবং পিতৃহারা হয়ে সেখানেই তিনি চোখের পানি ফেললেন।

অত্যচার

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের লীগ সরকার পূর্ব বাংলায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে এ অঞ্চল থেকে কমিউনিস্টদের তাড়াবার ব্যবস্থা করে।

কারণ তখনও এ অঞ্চলের অধিকাংশ পার্টি সভ্যই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত এবং কমিউনিস্টরাই ছিল লীগের একমাত্র সংগঠিত বিরোধী শক্তি। এসময় বিভিন্ন জেলখানাতে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা রাজবন্দির দাবিতে তৃতীয়বারের মতো অনশন ধর্মঘট চলাকালে নেতৃস্থানীয় কমরেড শিবেন রায় ঢাকা জেলে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সরকার অনশণ ধর্মঘটীদের রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেও জেলে অত্যাচার একবোরেই বন্ধ হয় নাই। ঢাকা জেলে কম. মনীগুহকে খুন, যশোর জেলে-কম. মোজ্জাম্মেলকে গলাটিপে হত্যা এবং খুলনা জেলে–কম. বিষ্ণু বৈরাগীকে লাঠিতে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

২৪শে এপ্রিল রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়াডে কমিউনিস্ট বন্দিদের উপর গুলী চালানো হলো। তালাবন্ধ এই ঘরে শহীদ হলেন সাতজন পার্টি সভা (১) কমরেড হানিফ শেখ, (২) কমরেড দেলোয়ার হোসেন (৩) কমরেড কম্পরাম সিং (৪) কমরেড

www.pathagar.com

আনোয়ার হোসেন, (৫) কমরেড সুখেন ভট্টাচার্য (৬) কমরেড বিজন সেন, (৭) কমরেড সুধীন ধর এবং আহত হলেন কমরেড আব্দুল হক, আ. শহীদ, অমূল্য লাহিড়ী, নুরুন্নবী চৌধুরী, রশীদ ও মনসুর হাবিবসহ ৩১জন রাজবন্দি। এদেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলো।

দলের চরিত্র পরিবর্তন

মে দিবস (৫৯) উপলক্ষে নারায়ন গঞ্জে জাহাজী শ্রীমিকদের সমাবেশ করা হয়। এ সময় মো. তোয়াহা ছিলেন নারায়নগঞ্জের অন্যতম শ্রমিক নেতা। এই শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পর মৌলনা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী, খান সাহেব ওসমান আলীর ছেলে জনাব সামছুজ্জোহার বাসায় উঠেন। এখানেই মৌলনা ভাসানী জানতে পারেন যে, মো. তোয়াহা প্রকাশ্যভাবে যুব লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং শ্রমিক নেতা হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি আসলে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অর্থাৎ কমরেড। মৌলনা ভাসানী, তোয়াহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লাইনের পরিচয় পেয়ে কেন জানি তাঁকে খুব কাছে টেনে নিলেন। অতঃপর ভাসানী–তোয়াহা সম্পর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তোয়াহার মতমত শহীদ সোহরওয়ার্দী যেমন শুনতেন, তেমনি মৌলানা ভাসানীও প্রায় বিনা দ্বিধায় মেনে নিতেন। এই অবস্থায় একদিন তোয়াহা সাহেব, মৌলানা ভাসানীর কাছে প্রস্তাব করেন যে, আওয়ামী মুসলিম লীগকে একটি অসম্প্রদায়িক সংগঠনে রূপ দেওয়ার জন্য। তোয়াহা সাহেব যুক্তি দেখান যে, এ অঞ্চলে অনেক হিন্দু নেতা কর্মী আছেন, কিন্তু তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনে যোগ দিতে পারছেন না। মৌলানা—তোয়াহাকে জানালেন যে, দলের উর্দ্ধোতন মহলে এই রূপ চিন্তাধারা এখনো বিকাশ লাভ করেনি। তিনি তোয়াহাকে পরামর্শ দিলেন, নিচের স্তর থেকে একাজ শুরু কর।

'মূলনীতি' বিরোধী আন্দোলন

পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী নবাব লিয়াকত আলী খাঁনের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবিধান কী ভিত্তিতে রচিত হবে, তা' দাঁড় করারবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি১৯৫০ সালে, সবিধানের মূলনীতি রিপোর্ট" হাজির করে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়— পাকিস্তান হবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র। এর ভিত্তি হবে, কোরআন এবং ছুন্নার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

উল্লেখিত এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে তোয়াহার নেতৃত্বে গণআজাদী লীগ আন্দোলন গড়ে তোলে। এডভোকেট সাখাওয়াৎ হোসেন, এডভোকেট কামরুদ্দিন আহম্মদ, অলি আহাদ ও তাজউদ্দিনকে নিয়ে অপর একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি তোয়াহার লিখিত "পাকিস্তান ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার" খসড়া দলিলটি গ্রহণ করে। অতঃপর ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে, আতাউর রহমান খাঁনের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল কনভেনশন বা জাতীয় মহাসম্মেলনে ঐ দলিলটি পঠিত ও গৃহীত হয়েছিল। এই সময় বিরোধী দলীয় মুখপত্র জনাব লবীব উদ্দীন সিদ্দিকী সম্পাদিত "ইনসাফ" পত্রিকায় তা ছেপে প্রকাশ করা হয়। তোয়াহার দলিলটি ছিল মূলত সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তানের উপর ভিত্তি করে লিখিত। ১০ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত সভায় মোহাম্মদ তোয়াহাকে সম্পাদক করে, পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৫২ সনের ২রা অক্টোবর গণচীনের রাজধানী পিকিং-এ এশীয় ও প্রশান্ত মহানসাগরীয় আঞ্চলীক শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য উক্ত কমিটির পক্ষথেকে পুর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খান, মোহাম্মদ তোয়াহা ও খন্দকার ইলয়াসের নামে তিনটি টিকিট পাঠান হয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য মোহাম্মদ তোয়াহা জেলখানায় বন্দি থাকাতে, তাঁর টিকিটে শেখ মুবিজবর রহমান এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

যুবলীগ

১৯৫১ সালের ২৭শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় পার্টির নিজস্ব যুবকদের নিয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক যুব লীগ' বিকাশিত হয়নি। সুতরাং কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট প্রগতিশীল যুবকদের নিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক যুব সংগঠন দাঁড় করাতে হবে। পার্টি সভ্য মোহাম্মদ তোয়াহাকে এজন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এসময় জাতীয় নেতাদের পাশ্বচর নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নূরুল হুদা মাহমুদ (ধনু ভাই) ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (লেংড়া আনোয়ার) কলকাতা থেকে ঢাকাতে আসেন। মোহাম্মদ তোয়াহা, ধনু ভাই ও আনোয়ার সাহেবের সাহায্যে যুব সংগঠন দাঁড় করাতে চেষ্টা নেন। এখানে ধনু ভায়ের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ধনু ভায়ের গ্রামের বাড়ি তোয়াহা সাহেবের জেলা ফেনীতে। ধনু ভায়ের পারিবারিক অন্যান্য সম্মানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন অবিভক্ত বাংলার আই জি, অব রেজিস্ট্রেন জনাব খাঁন বাহাদুর শামছুদ্দিন আহম্মদ, জনাব হাবিব উল্লাহ বাহার, মিসেস শামছুন্নাহার মাহমুদ, (তোয়াহা সাহেবের বন্ধু) সাংবাদিক জহুর হোসেনর চৌধুরী,

www.pathagar.com

নোয়াখালী পৌরসভার আমরন চেয়ারম্যান ও জেলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুষ্ঠপোষক জনাব চুন্ন মিঞা প্রমুখ।

ছাত্র নেতা আনোয়ার হোসেন তাঁর ৩৬ নম্বর র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের বাসার একটি কক্ষ যুব লীগ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির জন্য ছেড়ে দেন। এই প্রস্তুত কমিটি সভাপতি নূরুলহুদা সম্পাদক আনোয়ার হোসেন নির্বাচিত হযেছিলেন। এই অফিস কক্ষে যাঁরা যুব সংগঠনের জন্য কাজ করছিলেন তাঁরা হলেন পার্টির পক্ষ থেকে মোহাম্মদ তোয়াহা, তাসাদ্দুক হোসেন (সিলেট), আব্দুস সামাদ আজাদ, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, আলী আশরাফ (নারিন্দা), অলি আহাদ এবং পার্টির সহানুভূতি শীল তাজউদ্দীন আহম্মদ, ডা. আব্দুল করীম, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষে নিতাই গাঙ্গুলী, সাংবাদিক আলী আশরাফ, ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে আব্দুল ওয়াদুদ ও আব্দুল আউয়াল (পরে আদমজী মিলের ম্যানেজার) প্রমুখ। এই সংগঠনটি দাঁড় করাতে দেশব্যাপী যোগাযোগ রক্ষা করেন ধনু ভাই ও ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন ।

এপ্রিল মাসে এই যুব সম্মেলনটি ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই যুব সংগটনটি বন্ধ করতে সরকার ঢাকা কোর্টি এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। তাই খুব নেতারা বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্চিরাতে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠানের চেষ্টা নিলে পুলিশ সেখানেও ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে নেতারা নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসমান অবস্তায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় ২৫০ জন যুব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গঠিত হয় "পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ"।

এই যুব সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এক নির্দেশ নামায় পাটি সভ্যাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সংগঠনিতে মোহাম্মাদ তোয়াহাকে সভাপতি ও অলি আহাদকে সম্পাদক করা ঠিক হবে না। তাহলে এটি পার্টির সংগঠন বলে শত্রু পক্ষ প্রচার চালাবে। এছাড়া ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন পার্টির কেহ নহে, সুতরায় তাঁকেও সভাপতি করা যাবে না। বরং পাটির সহানুভূতি শীল আসাম প্রদেশিক মুসলীম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সিলেটের মাহমুদ আলীকে সভাপতি করা হোক।

পার্টির নির্দেশ অনুসারে সম্মেলনে নির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ হলেন, মাহমুদ আলী-সভাপতি, মোহাম্মদ তোয়াহা–সহসভাপতি, অলি আহাদ–সাধারণ সম্পাদক, ইমাদুল্লাহ ও মোহাম্মদ সুলতান-যুগ্ম সম্পাদক এবং আব্দুস সামাদ, গাজীউল হক, নূরুর রহমান, খন্দকার ইলিয়াস, আখলাকুর রহমান, খাজা আহম্মদ , আব্দুর রহমান, সর্দার আব্দুল হালিম, মৃনাল বাড়রি প্রমুখ সদস্য। এই সম্মেলনে কমরেড খোকা রায়, কমরেড তাসদ্দুক হোসেন, অলি আহাদ ও তাজ উদ্দিনের সাহায্যে মোহাম্মদ তোয়াহা লিখিত যুব লীগের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

পার্টির সংকীর্ণ চিন্তাচেতনার জন্য সংগঠনের মূল সংগঠক আনোয়ার হোসেন সভাপতি হতে পারলেন না। ধনু ভাই সবছেড়ে দিয়ে ঢাকায় "বুলবুল একাডেমী অব ফাইন আর্টস" তথা বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনায় মন দেন। তাই পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অফিস হয় মোহাম্মদ তোয়াহার বাসা–৪৩/১ যোগী নগর লেন, ওয়ারী।

পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে যুব সম্মেলন সমাধা হওয়াতে, র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রিট অফিসে যুব নেতারা আনন্দ উৎসবে যখন মসগুল, তখন গ্রামের বাড়ি থেকে আসা জনৈক ব্যক্তি মোহাম্মদ তোয়াহাকে জানায়— তাঁর দু'বছরের ছেলে বিনা চিকিৎসায় রোগে ভূগে মারা গেছে। এখানে প্রকাশ থাকে যে, মোহাম্মাদ তোয়াহা পিতাহীন হয়ে অর্থে কষ্টে পড়েন। তাই স্ত্রী-কন্যা-পুত্রকে গোপনে গ্রামের বাড়িতে রেখে এসে ছিলেন। তখন তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সোজাপথ ছিল–ঢাকা থেকে ষ্ট্রিমার যোগে বরিশাল ও তৎপর ভোলা এবং সেখান থেকে নৌকা যোগে মেঘনা পার হয়ে বাড়ির এলাকা।

পিতৃহীন তোয়াহা পুত্র শোক বুকে নিয়ে পার্টির কাজে ছুটি চাইলেন। কয়েক দিন পর পার্টির তরফ থেকে ছুটি মঞ্জুর হলো। পুত্রহারা স্ত্রী ও পুত্রের কবর দেখতে কমরেড তোয়াহা চললেন গ্রামের বাড়ি।

ইত্তেফাক

আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মসূচি ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য একটি খবরের কাগজ প্রকাশের উদ্যোগ লওয়া হয়। ফলে দলের কোষাধ্যক্ষ ঢাকায়া ইয়ার মোহাম্মদ খাঁনের টাকায়-১৯৫১ সাল থেকে মৌলনা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত হতে থাকে 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক'।

পরবর্তীতে রাজনৈতিক কাজের চাপের জন্য মৌলনা পত্রিকা চালাবার দায়িত্বদেন খাঁনের উপর। ফলে আগস্ট পর্যন্ত সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের প্রকাশক ও মুদ্রাকরের দায়িত্ব পালন করেন –ইয়ার মো. খান। এ সময় কলকাতা থেকে আগত সাংবাদিক (বরিশাল) মানিক মিয়া দলের সাথে সম্পীকত্ব হন। এসময় মৌলনা ভাসনী 'স্বাধীনতা দিবস' থেকে তথা ১৪ই আগস্ট থেকে মানিক মিয়াকে পত্রিকা চালাবার তথা সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। ১৯৫৩সালের ২৪শে ডিসেম্বর থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। তখনও পত্রিকার উপরে লেখা থাকত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা মৌলনা ভাসানী, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ইয়ার মোহাম্মদ খাঁন এবং সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন।

www.pathagar.com

শেরে বাংলা ফজলুল হক, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে, ঢাকার জেলা প্রকাশক ইয়াহিয়া চৌধুরীকে নির্দেশ দেন যে, ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতার স্থালে পৃষ্ঠপোষক' মৌলনা ভাসানী এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকর ইয়ার মোহামদ খাঁনের স্থলে তোফাজ্জাল হোসেন (মানিক মিয়া) নাম ছাপাতে। ইহা হক-ভাসানী দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। মৌলনা ভাসানী ১৯৫৭ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ ত্যাগ করে 'ন্যাপ' গঠন করলে মানিক মিয়া নিজেই ইত্তেফাক পত্রিকার মালিক হয়ে বসেন।

দ্বিতীয় কংগ্রেস

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষণা করা হলেও পাকিস্তানে তা হয়নি। কিন্তু পার্টির গৃহীত লাইনটি ছিল "ইয়া আজাদী জুটা হ্যায়" -এর নামে অতি বাবপন্থী। তাই সরকার কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য, ১৯৫১ মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে 'রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র' মামলায় চাপিয়ে দেয়। তে-ভাগা ও হাজং বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের উপরেও সরকারি নির্যাতনের চাপ বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে পার্টি লাইন সংশোধনের জন্য বছরের মাঝামাঝিতে পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠান করতে হয়।

এই বর্ধিত বৈঠকে কমরেড মনি সিংহরে থিসিস "বুর্জোয়া ভূস্বামী শাসকচক্রের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে" গৃহীত হয় । বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মূল হলো—

(১) পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র-সামন্তবাদী-বুর্জোয়া রাষ্ট্র।

(২) বিপ্লবের স্তর-জনগণতান্ত্রিক।

(৩) বিপ্লবের লক্ষ্য-সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ উচ্ছেদ।

(৪) পার্টির রণকৌশণ-আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে কাজ করে বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের সাথে সংযোগস্থাপন ও আন্দোলন গড়ে তোলা।

বৈঠকে কমরেড মনি সিংহকে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

ভাষা আন্দোলন

১৬ই অক্টোবর (৫১) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাব লিয়াকত আলী খাঁন খুন হলে, তাঁর অর্থমন্ত্রী (পাঞ্জাবের) গোলাম মোহাম্মাদ , মার্কিনীদের সাহায্যে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলের পদটি দখল করেন। আর খাজা নাজিমুদ্দিন তড়িঘড়ি করে হন— পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। এ-সময় বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, আমেরিকায়

www.pathagar.com

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে জানুয়ারিতে পাকিস্তানের উর্দুভাষী প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ২৭শে জানুয়ারি পল্টন জনসভায় ঘোষণা করেন—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন (কমরেড মতিন)–এর নেতৃত্বে ২৯শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং সেই সভার সিদ্ধান্তে ৩০শে জানুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতীক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের দিন বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছাত্রসভায় সিদ্ধান্ত হয়– আগমী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হরতাল।

৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে মৌলনা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্যের এক সর্বদলীয় কেন্দীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন কমরেড তোয়াহা। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তোয়াহার নেতৃত্বে গঠিত 'গণআজাদী লীগ'ই "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টেনে এনে ছিল।যাই হোক, বার লাইব্রেরি হলের এই সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

৪ঠা ফ্রেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয় এবং ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সভায় কর্মসূচি গৃহীত হয়– ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল এবং মিছিলসহ পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদ ঘেরাও। ঐ দিন কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদও ছাত্রদের গৃহীত কর্মসূচির অনুরূপ–পূর্ববঙ্গে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং মৌলানা ভাসানী এই কর্মসূচি সফল করার জন্য ছাত্র–জনতাকে আহ্বান করেন।

৬ ই ফেব্রুয়ারি মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১১ ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের জন্য 'পতাকা দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ও নেতা মহীউদ্দিনের জেল মুক্তির দাবিতে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 'অনশন ধর্মঘট' শুরু করেন। দলীয় সভপতি মৌলনা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী সরকারের কাছে আবেদন জানান যে, নিরাপত্তাবন্দী শেখ মুজিব ও মহীউদ্দিনকে মানবতার খাতিরে মুক্তি দেওয়া হোক।

২০শে ফেব্রুয়ারি সরকার একমাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। ঐ দিন সন্ধ্যায় আবদুল হাশিমের সভাপতিত্বে (মৌলনা ভাসানীর অনুপস্থিতে) আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভা বসে। এই সভায় আ. হাশিম, শামছুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, কমরুদ্দিন আহমদ, খয়রাত হোসেন প্রমুখ ১৪৪ ধারা অমান্য করার বিরুদ্ধে এবং ছাত্রনেতা অলি আহাদ ও আব্দুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ফলে

www.pathagar.com

ভোটাভুটিতে ১৫জনের মধ্যে ১১ জনই ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। কমরেড তোয়াহা ভোট দানে বিরত থাকেন। কারণ একই সময়ে কমরেড খোকা রায়ের সভাপতিত্বে আত্মাগোপকারী পূর্ব বঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির অপর সভার সিদ্ধান্ত ছিল – ২১ শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের যে সিদ্ধান্ত হবে, পার্টি সদস্যারা তা সমথন করবে। তোয়াহা অনুসারী অলি আহাদ, আ. মতিন ও গোলাম মাওলা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ভোট দেয়। ছাত্রনেতাদের বক্তব্য ও ভোটের প্রেক্ষিতে অত্রসভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্র সভায় আমাদের সিদ্দান্ত অগ্রাহ্য হলে, এই সংগ্রাম পরিষেদের বিলুপ্তি ঘটবে।

কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক শেষে ছাত্রনেতারা রাতে এস, এম, হলে এক ছাত্র সভায় মিলিত হয়। এ সভায় আওয়ামী ছাত্র লীগের নেতারা ছাড়া অন্যান্য ছাত্রনেতারা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

২১ শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের আমতলায় ছাত্রনেতা গাজীউল হাকের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা শুরু হয়। এ সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত (১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করা) ঘোষণা করে, বক্তব্য রাখেন পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামছুল হক। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক (কমরেড) আব্দুল মতিন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য তাঁর নেতা কমরেড তোয়াহার পরিকল্পনা ১০জনের ছোট ছোট দলে মিছিল শুরু করার কথা প্রস্তাব করেন। তারপর "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" "চলো চলো এসেম্বলি চলো" শ্লোগান দিয়ে প্রথম ছাত্র দলটি রাজপথে পা দিতেই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে; তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং তারপর স্রোতের মতো ছাত্ররা রাজপথে নেমে পড়ে। পুলিশ গ্রেফতার বাদ দিয়ে ছাত্রদের সাথে হাতাহাতি ও লাঠি পেটা করতে থাকে। ছাত্ররা লাঠির আঘাতে ও টিয়ার গ্যাসে আহত হয়েও প্রাদেশিক পরিষদ (এসেম্বলি) ভবন (বর্তমানে জগন্নাথ হল) ঘেরাও করার জন্য দুপুরের মধ্যেই প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র মেডিকেল কলেজ এলাকায় অবস্থান লয়। বিকালে প্রাদেশিক পরিষদে সভা। বিকাল তিনটায় পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের ভিতরে ঢুকে গুলী চালালে বার নম্বর ব্যারাকের সামনে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র আব্দুল বরকত গুলীবিদ্ধ হন, মাথায় গুলী বিদ্ধ হন মানিক গঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিক উদ্দিন এবং হোস্টেলের ২০ নং শেডের অতিথি গফুর গাঁয়ের পাঁচুয়া গ্রামের কৃষক-যুবক আব্দুল জব্বার।

ছাত্র সংবাদ প্রচারের জন্য, মেডিকেলের ছাত্র সংসদের ভি. পি. গোলাম মাওলা; জি. এস. শরফুদ্দিন এবং সাঈদ হায়দার, আবুল হাশেম, আহমদ রফিক প্রমুখের সাথে আলোচনা করে ছাত্র কর্মী ইয়াহিয়া কলেজের ২০/১ নং রুমে 'কন্ট্রোল রুম' স্থাপন করে মাইকে ঘোষণা করা হয়, "রক্তের বদলে রক্ত চাই–নূরুল আমিনের কল্লা চাই" " "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" "ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিন"।

www.pathagar.com

২২শে ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) সকালে কার্ফু ভেঙে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে ১০/১২ হাজার জনতা শহীদের গায়েবী জানাজা আদায় করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী আব্দুর রহিম চৌধুরী ও অন্যান্যদের কাছ থেকে কন্ট্রোল রুমের মাইকটি কেড়ে নিয়ে যায়। এদিন নবাব পুর রোডে হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমানসহ প্রায় চার জন পুলিশের গুলীতে শহীদ হন। এদিন শেরে বাংলা ফজলুল হক, আবুল হাশেম ও মৌলনা ভাসানী পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে সংবাদ পত্রে বিবৃতি দেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে এস. এম. হল প্রাঙ্গণে গায়বী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে শহীদ বরকতের গুলীবিদ্ধ স্থানে (বর্তমানে মেডিকেলের আউট ডোর ডিসপেন্সারী ভবনের মাঝে) মেডিকেল ছাত্রদের সারা রাতের ফসল দশ ফুট উঁচু ও ছয় ফুট চওড়া 'প্রথম শহীদ মিনার' ২৪শে ফেব্রুয়ারির ভোরে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

২৫শে ফেব্রুয়ারি রাতে (পাঁচ দিন একটানা হরতালেরর পর) সর্বদলীয় কর্মপরিষদ পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পুলিশ শহীদ মিনার ভেঙে ফেলে। এদিন ফরিদপুর জেল থেকে শেখ মুজিব মুক্তি পান। ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনিদিষ্ট কালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের পুলিশ বাহিনী ২১শে ফেব্রুয়ারি যুবলীগ নিয়ন্ত্রিত ছাত্র মিছিলের গুলী চালায়ে 'ভাষা আন্দোলন' বন্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ছাত্রনেতারা আত্মগোপন করে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশ্য ৯ই মার্চ ডা. মুত্তালিবের শান্তি নগরের বাসায় গোপন সভা করার সময়– মোহাম্মদ তোয়াহা, মীর্জা গোলাম হাফিজ, অলি আহাদ, এস. এম. হলের ভি. পি. ও জি. এস মুজিবুল হক ও হেদায়েত হোসেন সহ মোট আট জন আন্দোলনের মূল নেতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে মোহাম্মদ তোয়াহর দু'বছরের জেল হয়। জেলে থেকেই মোহাম্মদ তোয়াহা যুবলীগের পরবর্তী সভাপতি নির্চাচিত হন।

ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতা হত্যার পর সারা প্রদেশব্যপী সরকার বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রনেতারা ২৬শে এপ্রিল একটি অসাম্প্রাদায়িতক ছাত্র সংগঠন– 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন। ফলে এক বছরের মধ্যেই নূরুল আমিনের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীসহ অন্যান্য রাজবন্দিদের জেল থেকে মুক্তি দিলেন। নভেম্বরে ছাত্র সংগঠনের নাম পারিবর্তন করা হয়–পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. সুলতান। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ইতোপূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশনের সিলেট জেলা নেতা কমরেড অরবিন্দুর নেতৃত্বে জনাব আসদ্দর আলী ও জনাব তারা মিঞা সিলেট জেলার ছাত্রদের সংগঠিত করেন। ১৭ই নভেম্বর (১৯৫১) সিলেট জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ধার্য হলে জেলা কর্তৃপক্ষ শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ফলে ঢাকা থেকে আগত অতিথি যুবলীগ নেতা অলি আহাদ ও এডভোকেট ইমাদুল্লাহসহ জেলার সকল ছাত্র কর্মীরা ট্রেন যোগে ফেঞ্চুগঞ্জ চলে যান। কিন্তু এখানেও পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করলে ১৮ই নভেম্বর সবাই শহরের বাহিরে একটি টিলার উপর যয়ে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই সম্মেলনে পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামে একটি প্রগতিশীল সংগঠন জন্ম লাভ করে। এই সম্মেলনে সভাপতি পদে আব্দুল হাই এবং সাধারণ সম্পাদক পদে রুহুল কুদ্দুস নির্চাচিত হন। এই ছাত্র সংগঠন গড়তে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড রুহুনী দাস ওরফে তাহের ভাই, কমরেড লালা শরদিন্দু দে ওরফে বুলি দা, কমরেড দীনেশ চৌধুরী প্রমুখ।

এ বছর প্রথম "আদমজী পাট কল মজদুর ইউনিয়ন"গঠিত হলো। এই ইউনিয়ার সভাপতি নির্চাচিত হলেন– প্রাক্তান যুবলীগ সভাপতি মাহমুদ আলী এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন কমরেড দেওয়ান মাহবুব আলী। পরে মৌলনা ভাসনী এই সংগঠনের সভাপতি নির্চাচিত হয়ে ছিলেন।

প্রকাশ্য টীম

১৯৫২ সালে আগস্ট মাসে কমরেড নূরুন্নবী জেলখানা থেকে ছাড়া পান। জেলখানায় আটক পার্টি নেতাদের সিদ্ধান্তনুসারে তিনি কুমিল্লার বড় মিয়া এবং বগুড়ার আ. মতিনকে নিয়ে আক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রকাশ্য টীম গঠন করেন। এসময় কমরেড মনোরমা বোস (মাসীমার) মেয়ে ভোজনা বোস জেলখানা থেকে মুক্তি পান। তাঁকেও এই প্রকাশ্য টীমের সদস্য ভূক্ত করে টীম, মুখ্যমন্ত্রী— নূরুল আমিনের সাথে দেখা করেন। নূরুল আমিন টীম সদস্যদের জানান যে, কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে বে–আইনী করা হয়নি; সুতরাং পার্টি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। ফলে প্রকাশ্য টীম বংশাল রোডে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ঘুলে বসে। এসময় কমরেড আলী আকসাদ এবং কে. জি. মোস্তফা প্রকাশ্যে টীমে যুক্ত হন এবং গোপনে কমরেড মির্জা আব্দুস সামাদ (লেখিকা লায়লা সামাদের স্বামী) মূল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই টীমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

www.pathagar.com

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সদস্যদের উদ্যোগে 'জনতন্ত্রী দল' নামে একটি প্রকাশ্য প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন— কমরেড হাজী দানেশ এবং মাহমুদ আলী সাধারণ সম্পাদক।

এ বছরেই শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করা জন্য কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত হলো 'ঢাকা জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন'। জেলে থেকে কমরেড তোয়াহা এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। তখন এদেশে নেপাল নাগের নেতৃত্বে আর. এস. পি. এবং বলশেভিক পার্টির নামে দুটি সংগঠন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করত। এছাড়া শ্রী দীনেশ সেনের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলায় অকমিউনিস্টটের শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠে ছিল, দেশ বিভাগের পর তাঁরা কলকাতা থেকে ঢাকায় আগত শ্রমিক নেতা আলতাফ আলী ও ফয়েজ আহম্মদের সাথে একত্রে পুনর্গঠিত করে "পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার " দাঁড় করান। এই সংঘটনটির সভাপতির দায়িত্ব পান এডভোকেট কামরুদ্দিন আহম্মদ। [বর্তমান এই শ্রমিক সংগঠনটি "বালাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ" নামে বেঁচে আছে।]

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে 'খাতামুন্নবী'–এর অর্থকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামী পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ 'আহম্মদিয়া বিরোধী দাঙ্গা' বাধিয়ে বহু মুসলিম হত্যা, নারী ধর্ষণ, লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করে। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে। সামরিক আইন প্রশাসক লে. জে. আজগর খাঁন কঠোর হাতে দাঙ্গা দমন করেন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী এই দাঙ্গার নায়ক মওলানা মওদুদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করে মৃত্যু দন্ড মওকুফ করেন। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন এই দাঙ্গায় সহযোগিতা করার অপরাধে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মোমতাজ মোহাম্মদ খান দণ্ড লাতানাকে বরখাস্ত করে, পূর্ব বাংলার গভর্ণর মালিক ফিরোজ খাঁন নুনকে তাঁর স্থলাভিসিক্ত করেন।

১৯৫৪ সনের ৮ই থেকে ১২ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যুব লীগের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ তোয়াহাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তাই আরজাহান তোয়াহা শিউলী, স্বামীর অবর্তমানে তাঁর নির্বাচিত এলাকায় স্বামীর পক্ষে প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। মোহাম্মদ তোয়াহা ১৭ মাস জেলখেটে ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি পান।

www.pathagar.com

এসময় যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতাদের নির্বাচনে অংশ লওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই কমরেড তোয়াহা জেল মুক্ত হয়ে গুলিস্তান সিনেমা হলের পিছনে 'রমনা রেস্ট হাউজে' যেয়ে শহীদ সোরওয়াদী সাথে দেখা করেন। শহীদ সাহেব মোহাম্মদ তোহার কাছে যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত জানতে চান। তোয়াহা সাহেব বলেন— শেরে বাংলা ও মৌলনা ভাসানীকে সাথে নিয়ে নির্বাচন করলে সরকারি দলের পতন হওয়া সম্ভব, অন্যথায় ত্রিপথে ভোট ভাগ হয়ে যাবে। শহীদ সাহেব তাঁর সাথে একমত হয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন— তোমার যুব বাহিনী নিয়ে অন্য নেতাদ্বয়কে রাজী করাও। ফলে মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদের নেতৃত্বে যুবলীগের কর্মীবাহিনী কারকুন বাড়ি লেনের জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাসায় মৌলনা ভাসানী এবং কে. এম. দাস লেনে শেরে বাংলার বাসা ঘেরাও করে শ্লোগান তোলে হক-ভাসানী সোরওয়ার্দী–"এক হও , এক হও"। মানবতাবাদী নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তরুণদের কাছেনতি স্বীকার করলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু নেজামে ইসলামপ্রধান কুমিল্লার মৌলনা আতাহার আলীকে যুক্তফ্রন্টে লওয়ার জন্য জেদ ধরলেন। পরে নেজামে ইসলামের বিরোধীতা সত্ত্বেও শহীদ সাহেবের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে কমরেড হাজী দানেশের নেতৃত্বে গণতন্ত্রী দলও যুক্তফ্রন্টে যোগদিল। নেজামে ইসলামের বিরোধিতার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি স্বতন্ত্রভাবে কয়েকজন হিন্দু কমরেডকে মনোনয়োন দিলেন এবং বাকি অন্যান্য কমরেডগনকে যুক্তফ্রন্টের মধ্য থেকে নির্চানে অংশ লওয়ার নির্দেশ দিল।

এই নির্বাচনে নান্দাইলের (যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী) খালেক নেয়াজের কাছে মুসলিম লীগ প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী নরুল আমীন সূচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। নির্বাচনে ২৩৭ টি মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ টি, মুসলিম লীগ ৯টি এবং স্বতন্ত্র ৫টি আসন লাভ করে। এছাড়া ৭২ টি সাধারণ নিবার্চনী অমুসলিম কেন্দ্রের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস-২৫টি, সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন–২৭টি, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট-১৩টি, গণতন্ত্রী দল- ৩টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি–৪টি আসনে জয়লাভ করে। বিজয়ী এই চারজন কমরেডরা হলেন চট্টগ্রামের পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও অধ্যাপক সুধাংশু বিমল দত্ত, সিলেটের বরুণ রায় এবং রংপুরের অভয় বর্মন। এ ছাড়া অন্যান্য পার্টির টিকিটে –মোহাম্মদ তোয়াহা, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, অধ্যাপক সর্দার ফজলুল করীম, অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ, সাহিত্যিক সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, মাহমুদ আলী, মহীউদ্দিন আহম্মদ, সেলিনা বাণু, আব্দুল করিম (পটুয়াখালী), আতউর রহমান (রাজশাহী) সহ ২৪ জন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য এই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ক্ষমতাশীন দলের সর্বমোট দশ জন প্রার্থী এই প্রাদেশিক আইন সভা নির্বাচনে জয়লাভ করে ছিলেন।

www.pathagar.com

১৪ই এপ্রিল ঢাকার লায়ন সিনেমা হলে যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি মৌলনা ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন "তথা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের" দাবি জানান।

এসময় পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হোরেস হিলড্রেন সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, এই নির্বাচন মেনে লওয়া যায় না। তবে তিনি আরও বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করবে না।"

১৯শে এপ্রিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুর সাথে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি দেয়।

এ-সময় পশ্চিম পাকিস্তানে খাদ্য সংকট দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে, আমেরিকা সরকারের কাছ থেকে খাদ্য সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলেন। এই সুযোগে মার্কিনীরা রাষ্ট্রদূতকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর লোভ দেখিয়ে তাদের হাতের মুঠোয় ভরে ফেলে। পরে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, রাষ্ট্রদূতকে রাজধানীতে ডেকে পাঠালে মোহাম্মদ আলী রাজধানীতেতে ফিরে আসেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার চৌধুরী জাফর উল্লার সহযোগিতায় তিনি গভর্ণর জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করেন। ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে মার্কিনী দালাল ব্রিটিশ আমলা পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (পাঞ্জাব) কালবিলম্ব না করে, ১৭ই এপ্রিল রাতেই পশ্চিম পাকিস্তানে খাদ্য সংকট এবং আহম্মদিয়া বিরোধী দাঙ্গা মোকাবিলায় ব্যর্থতার অজুহাতে নাজিুদ্দিনের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। একই সাথে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দিলেন।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, ১৯৪৭ সনের ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর কালে প্রণীত 'ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা আইন' ছিল-মন্ত্রিসভা, গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ বা অপসারণ করার একমাত্র আইনগত সংস্তা। আমরা জানি– মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান হন এবং তাঁদের উপরে নামেমাত্র গভর্ণর জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

গভর্ণর জেনারেলের এই ক্ষমতা বর্হিভূত কাজের জন্য পুর্ব বার মুসলীম লীগ নেতা ও গণপরিষদের স্পীকার মওলানা তমিজউদ্দিন খাঁন, গভর্নর জেনারেলের ডিগ্রীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে লাহোর হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী নবাব লিয়াকত আলী খাঁনকে খুন করা হলো এবং সর্বশেষে নবাব স্যার নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে আমলাতন্ত্রের মাথায় ভর করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানে এসে হাজির হলো। ছবি হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব।

www.pathagar.com

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রুশ-চীন তথা সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ঘেরাও এবং ধ্বংস করার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে, এদেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সামন্ত (নবাব)–দের শাসন নির্মুল করে, প্রতিষ্ঠা করে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা। অতঃপর এদেশে তথা পাকিস্তানে , মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে রাজা বদল হতে থাকে।

বান্দুং সম্মেলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় ভাঙন লাগে। যুদ্ধের পর রাশিয়ার নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আত্মরক্ষামূলক "ওয়ার্স জোট" গড়ে তোলে এবং তৃতীয় বিশ্বের গরিব রাষ্ট্রগুলোও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বাঁচতে ১৯৫৫ সনের ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এশিয়ার ও আফ্রিকার দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক বিনির্মান ও উন্নয়নের এবং বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে জোট নিপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করে। পাকিস্তান পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। পুর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল চৌধুরী খালেকুজ্জামান, ৩রা এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারী বোর্ডের নেতা–শেরে বাংলাকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান। শেরে বাংলা মো. তোয়াহাকে মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিলে (কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ না থাকায়) তিনি বিনিময়ের সাথে মন্ত্রী হতে অস্বীকার করেন। ফলে তোয়াহার স্থলে শেখ মুজিবর রহমানকে মন্ত্রী করা হয়।

১৫ই মে শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফন্টের মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান চলাকালে, অবাঙালি মিল কর্তৃপক্ষ আদমজী চটকলে, বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা বাধায়ে দিলে পনের হাজার শ্রমিক নিহত হয়। মার্কিনী ষড়যন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে, এই দাঙ্গা বাধায়ে দিয়ে ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯শে মে রাজধানী করাচিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার চৌধুরী জাফর উল্লাহ এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য-এ্যাফেয়ার্স কেনেথ ইয়ামসন" "পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি" স্বাক্ষর করেন।

প্রধানমন্ত্রী পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভার সদসগণকে রাজধানীতে ডেকে পাঠান এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার অবর্তমানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে ধ্বংসের পদক্ষেপ লয়। ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকার চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে অপসারণ করে, তাঁর স্থলে পাকিস্তানের ডিফেন্স সেক্রেটারি– মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে পূর্ব পকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। জেনারেল মীর্জা

www.pathagar.com

ক্ষমতা হাতে পেয়েই আদমজী দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে "কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ" বলে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা জারি করে, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিপরিষদকে বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে রাজধানী থেকে ফিরেই হক সাহেব গৃহবন্দি হলেন এবং হাজার হাজার দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের জেলে বন্দি করা হলো। ৪ঠা জুলাই এদেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো। এসময় মৌলনা ভাসানী বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে অবস্থান করছিলেন। গভর্ণর বেতারে ঘোষণা করেন, "মৌলনা ভাসানী রাষ্ট্রদ্রোহী' দেশে ফিরলে এমন লোক দিয়ে গুলী করে হত্যা করা হবে, যার হাত কাঁপবেনা"। শহীদ সোরওয়াদীকেও রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করা হয়। এসময় শহীদ সাহেব চিকিৎসসার জন্য সুইজারল্যান্ড ছিলেন। বগুড়ার মোহাম্মাদ আলী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তাঁর এই সফরে উদ্দেশ্য ছিল শাসক পার্টিতে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা। ফলে ঢাকার কার্জন হলে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অদিবেশন ডাকা হলো। এই অধিবেশনে মার্কিনপন্থী একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি ঘোষণা করে। অতঃপর নাজিম–আমিনের নেতত্বে ব্রিটিশপন্থী সংখ্যায় গরিষ্ঠ গ্রুপ ঘোষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৪৬ সনের নির্বাচনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের ফলাফল ছিল, (১) পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দার হায়াত খার 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ, (২) সিন্ধু তে (পাঞ্জাব) আল্লাবক্স, আয়ুব খয়ের প্রমুখের বিরোধিতার জন্য মুসলিম লীগ পরাজিত হয়ে ছিল, (৩) সীমান্ত প্রদেশে ডা. খান ও তাঁর ছোট ভাই সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান (মূলনেতা) ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে সম্পৃক্ত এবং (৪) বেলুচিস্থানের নেতৃত্ব ছিল 'বেলুচগান্ধী' আব্দুস সামাদ আচক জাই–এর নিয়ন্ত্রিত এবং তিনি সীমান্তের খান ভ্রাতিদ্বয়ের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন,। তাই কেন্দ্রের (শাসক দলের) একমাত্র ভরসা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ। কিন্তু এখানেও প্রধানমন্ত্রী সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে ব্যর্থ হলেন।

মার্কিনের কূটনৈতিক চাপে গভর্ণর জেনারেল ২৪শে অক্টোবর সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে গণপরিষদ ভেঙে দেন এবং প্রাধানমন্ত্রীকে নুতন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, গভর্ণরের পরামর্শে নূতন একটি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন। এই মন্ত্রিসভার সদস্যরা হলেন, মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থ সচিব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী অর্থমন্ত্রী, সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল আয়ুব খান- দেশরক্ষা মন্ত্রী, পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগপ্রধান শহীদ সোরওয়ার্দী আইন মন্ত্রী; কে. এস. পির আবু হোসেন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রি। এছাড়া সীমান্ত

www.pathagar.com

প্রদেশের ডাঃ খান সাহেব, এম, এইচ, ইস্পাহানী প্রমুখ মন্ত্রীসভার সভ্য হলেন। কে. এস. পি. প্রধান শেরে বাংলা ফজলুল হক- পূর্ব বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হলেন।

এই ঘোষণার পরে পত্রিকা খবরে জানা গেল- শহীদ সাহেব রোগ মুক্ত। অতঃপর গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের বিশেষ দূত হয়ে "ইভনিংটাইম"-এর সম্পাদক জেড. এ. সুলেরী সুইজার ল্যান্ড যেয়ে শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করেন। পরে আতাউর রহমান খাঁনও শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করে আসেন। ১১ই ডিসেম্বর শহীদ সোরওয়ার্দী করাচির বাসায় ফিরে আসেন। ১৮ই ডিসেম্বর শেখ মুজিবর রহমান জেল থেকে মুক্তি পান। ২০শে ডিসেম্বর শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

মোহাম্মদ আলীর এই নূতন মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতায় বসেই মার্কিনীদের স্বার্থে গঠিত, কমিউনিস্ট বিরোধী " দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া জোট" (South-Eeast Asia Treaty Arganisation SEATO) এবং বাগদাদ চুক্তি সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ করে। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ইরাক ও তুরস্ককে একত্র করে এই সংস্থা গঠিত হয়ে ছিল। কিন্তু একটি প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক সামরিক অভ্যুত্থানে ইরাকি প্রধান নূরী আল-সাইদ সরকারের পতন ঘটলে, এইচুক্তি বতিল করে, বাগদাদ চুক্তির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "কেন্দ্রীয় চুক্তি জোট" (Central Treaty oRganisation CENTO) ।

১৯৫৫ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খানের মাধ্যমে শেরে বাংলার নেতৃত্ব থেকে অপসারণের জন্য 'অনাস্থা প্রস্তাব' আনায়ন করেন। ভোটাভূটিতে শেরে বাংলা ১১৯ এবং আতাউর রহমান খান ১০৫ ভোট পান। ফলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরল। যদিও লন্ডন থেকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান মৌলানী ভাসানী এবং জেলখানা থেকে মোহাম্মদ তোয়াহাসহ অন্যান্যরা, শেখ সাহেবকে যুক্তফ্রন্ট ভাঙা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানায়ে ছিলেন।

মার্চ মাসে গভর্ণর জেনারেল পশ্চিম পাকিস্তানে 'এক ইউনিট' গঠন করে এক ডিগ্রী জারি করেন। এছাড়া ১৫ই এপ্রিল 'সংবিধান কনভেনশন' আদেশ জারি করেন। সোরওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সরকার ভাসানীর উপর থেকে, বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করলে তিনি ২৫শে এপ্রিল ঢাকাতে ফিরে আসেন। পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী, পাকিস্তান আওয়ামী লীগপ্রধান শহীদ সোরওয়াদী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২৬শে এপ্রিল 'সংবিধান কনভেনশন' গ্রহণ করে। দেশবাসী আইনমন্ত্রীর সংখ্যা সাম্য, এক ইউনিট ও সংবিধান কনভেনশন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সচ্চার হলে, শহীদ সাহেব ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজন বোধে সামরিক বিধান মাধ্যমে দেশের সংবিধান জারি করা হবে।

১০ই মে প্যাটেলের মামলার রায় দান কালে ফেডারেল কোর্ট, পাকিস্তানের গভর্ণর

www.pathagar.com

জেনারেলকে 'কনষ্টিটিউশন কনভেনশন'-এর পরিবর্তে অবিলম্বে গণপরিষদ গঠনের নির্দেশ দেয়। ফলে ২৮শে মে, গভর্ণর জেনারেল 'সংখ্যা সাম্যের' (পাকিস্তানের উভয় অংশের গণপরিষদ সদস্য সমান হবে, যদিও পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি।) ভিত্তিতে ৮০ জন সদস্যের গণপরিষদ গঠনের এক আদেশ জারি করেন। এই সাথে দেশ থেকে 'জরুরি অবস্থা' প্রত্যাহার এবং পূর্ব পাকিস্তানের আইনপরিষদের উপর থেকে 'স্থগিত আদেশ' প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেন। এই পরিস্থিতিতে শহীদ সোরওয়ার্দী মন্ত্রিসভা থেকে বের হয়ে এসে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার দিকে মন দিলেন। কারণ এসময় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। শহীদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে এসে, জে. মীর্জার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মোহাম্মদ তোয়াহাকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এসময় সরকারকে না চটান। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী স্বাক্ষরিত 'পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তি" বিরোধী, আন্দোলন মোহাম্মদ তোয়াহা তথা পার্টির প্রকাশ্য গণসংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে শুরু হয়ে গিয়ে ছিল। শহীদ সাহেব, কমিউনিস্ট হওয়াতে মোহাম্মদ তোয়াহা ও হাজী দানেশকে বাদ দিয়ে, আতাউর রহমান খানকে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টরী পার্টির নেতা এবং আবুল মনসুর আহম্মদ ও শেখ মুজিবর রহমানকে উপনেতার দায়িত্ব দেন। অতঃপর তিনি করাচি থেকে মাদ্রিদ (স্পেন) হয়ে আমেরিকা সফরে বের হলেন।

১৫ মাস পর অর্থাৎ ৩রা জুন, প্রধানমন্ত্রী এপ্রদেশ থেকে ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার করেন। তিনি ৬ই জুন, শেরে বাংলার পরামর্শে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেন। শহীদ সাহেবের আশা ব্যর্থ হলো।

এই সময় নতুন গণপরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৩৮টি আসনের একটি (প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী) শাসক মুসলিম লীগ এবং অপর আসনটি কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র প্রার্থী (সর্দার ফজলুল করীম) লাভ করেন।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে, মার্কিনের নির্দেশ মতো "পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তি" সম্পাদনা করেন। কিন্তু সংখ্যা লঘিষ্ঠের জন্য গণপরিষদে এই চুক্তি পাশ করাতে ব্যর্থ হন। ফলে আমেরিকার কাছে তাঁর প্রযোজন শেষ হয়ে যায়। গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্যহন এবং অর্থমন্ত্রী (বিভাগপূর্ব ভারতের এডিট একাউন্টস সার্ভিসের অবসর প্রাপ্ত আমলা) পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। প্রকাশ থাকে যে, গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগের সদস্য ছিল-২৭জন এবং আওয়ামী লীগের মাত্র ১২ জন।

www.pathagar.com

৫ই আগস্ট গভর্ণর জেনারেল 'স্বাস্থ্যগত কারণে' (আসলে আমলাদের চাপে) ছুটি নিলে মে. জে. ইস্কান্দর মীর্জা ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল হলেন। ১০ই আগস্ট চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এতে শেরে বাংলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান এবং জেনারেল আয়ুব খাঁন ব্যারাকে ফিরে যান। আর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত হন। শহীদ সোওয়ার্দী কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের প্রথম বিরোধী দলীয় নেতার সম্মান পেলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইনসভা, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির (কে. এস. পি)র কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে গঠিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী কমিউনিস্ট সভ্যসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দিলেন। এসময় সারা দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে দ্বিতীয়বার 'পুলিশ ধর্মঘট' শুরু করে।

২১ থেকে ২৩শে অক্টোবর ঢাকার সদর ঘাটের পিকচার হাউজ (রূপমহল) সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিস লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পার্টিতে কমরেড তোয়াহাকে বলা হতো 'জনমত জরীপ পারদর্শী' এবং অধ্যাপক মোজাফর আহম্মদকে বলা হতো 'রাজনৈতিক আবহাওয়াবিদ'। হলে অধ্যাপক সাহেব বললেন, তোহা ভাই, সম্মেলনে "স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি" ও দলকে "অসাম্প্রদায়িক" প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবে। বাস্তবে তাই-ই ঘটল। শহীদ সাহেবের সভাপতিত্বে এবং শেখ মুজিবের প্রস্তাবে ঐ প্রস্তাব দুটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল। ফলে এখন থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ হলো শুধু আওয়ামী লীগ।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, ইতঃপূর্বে বগুড়ার জয়পুর হাটে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মী সম্মেলন মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে ছিল। সেই সভায় সভাপতি আঞ্চলিক সমস্যা ও তেভাগা আন্দোলনের উপর বক্তব্য রাখেন এবং কমরেড তোয়াহা গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও দলকে অসাম্প্রদায়িক করার বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যের বিপক্ষে জনাব খয়রাত হোসেন আপত্তি করে বক্তৃতা দেন। পরে ভোটাভূটিতে শেখ মুজিবর রহমানসহ সবাই তোয়াহা সাহেবকে সমর্থন করেন এবং খায়রাত হোসেন পান মাত্র চারটি ভোট। খায়রাত সাহেব ভোটে হেরে যেয়ে সভাপতিকে অনুরোধ করেন যে, দলের কাউন্সিল ডেকে এই প্রস্তাব পাশ করার জন্য। অতঃপর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

পার্টি কংগ্রেস

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে গোপনভাবে কলিকাতায় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কংগ্রেস সেখানকার সরকারি মহল জেনে যায়। তাই পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায় বিরোধী দলীয় নেতাকে বলে ছিলেন "ওহে জ্যোতি, তোমার পাকিস্তানি কমরেডদের একটু সতর্ক চলাফেরা করতে বল। ওখানে (পাকদূতাবাসে) সব রিপোর্ট হয়ে যাচ্ছে।" যাই হোক এ সম্মেলনে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র' গঠনের পক্ষে প্রস্তাব আসলেও তা' পাশ হয়নি। বরং দুটি মূল প্রস্তাব পাশ হয়ে ছিল, তা হলো-(১) পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখার পরিবর্তে এখন থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পার্টি হিসেবে কাজ করবে। (২) দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান ধারা আওয়ামী লীগে প্রবাহিত; কাজেই আমাদের আওয়ামী লীগের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।"

সম্মেলনে ১৩ জনের একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যরা হলেন (১) মনি সিং (ময়মনসিংহ), (২) সুধীন রায় ওরফে খোকা রায় (ময়মনসিংহ), (৩) নেপাল নাগ (ঢাকা), (৪) অনিল মুখার্জী (ঢাকা), (৫) শহীদুল্লাহ কায়সার (ঢাকা), (৬) বরিন দত্ত (সিলেট), (৭) মো. তোয়াহা (নোয়াখালী), (৮) সুখেন্দু দস্তিদার ওরফে বশির ভাই (চট্টগ্রাম), চৌধুরী হারুন-উর রশিদ (চট্টগ্রাম), (১০) আলতাফ হোসেন (ময়মনসিংহ), (১১) অমিয় দাশ গুপ্ত (বরিশাল) এছাড়া দুইজন বিকল্প সদস্য (১) ডা. মারুফ হোসেন (যশোর) (২) কুমার মিত্র (ফরিদ পুর)। কিন্তু অমিয় দাশ গুপ্ত ও কুমার মিত্র ভারতে থেকে গেলে অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ (কুমিল্লা) ও সর্দার ফজলুল করীম (বরিশাল)-কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কো-আপ্ট করা হয়। সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হলেন (১) মনি সিং, (২) খোকা রায়, (৩) নেপাল নাগ এবং সম্পাদক মণ্ডলীর সম্পাদক হলেন কমরেড মনি সিং।

১৯৫৬ সনের জুলাই-আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানের চাউলের দাম প্রতি মণ দশ টাকা থেকে বেড়ে বার টাকায় উঠে। আবু হোসেন সরকার দলীয় পরামর্শে "ওপেন মার্কেট অপারেশন" করতে সরকারি গুদাম খুলে দিলেন। আর সেই সুযোগে তাঁর দলীয় চোরাকারবারীরা সমস্ত চাউল কিনে অধিক লাভের জন্য লুকিয়ে ফেলে। তখন দেশে ফের কৃত্রিম অভাব দেখা দেয় এবং চাউলের মণ হয় কুড়ি টাকা।

৪ঠা আগস্ট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকায় এক ভুখা মিছিল বের করা হয়। ঐ মিছিলে পুলিশ গুলী চালালে একজন নিহত হয়। পরে পল্টন ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতায় বলেন, "আবু হোসেন সরকার তুমি একটা পুঁটি মাছ; তোমাকে তেলে

www.pathagar.com

ভাইজা খাইয়া ফালামু" এবং "ভাইসব, একবার ক্ষমতায় যাইয়া লই, দশটাকা মণ দরে চাউল খাওয়ামু" ইত্যাদি। খাদ্য পরিস্থিতি পরবর্তন না হওয়াতে গণবিক্ষোভের ভয়ে ৩০শে আগস্ট আবু হেসেন সরকার পদত্যাগ করে। ফলে প্রদেশে গভর্ণরের শাসন চালু হয়। কিন্তু ৫ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের অপর একটি বিক্ষোভ মিছিলে পুলিম গুলী চালালে চার জন নিহত হয়। ফলে শেরে বাংলা ফজলুল হক, ঐ রাতেই বিরোধী দল আওয়ামী লীগপ্রধান মৌলানা ভাসানীকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেন। অতঃপর আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মৌলানা ভাসানীকে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব দেওয়া হলো। মজলুস নেতা মৌলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রীসভা গঠনের নির্দেশ দিলেন। ফলে ৬ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

অবশ্য মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পূর্বে পার্টি প্রধান শহীদ সাহেব বন্ধুদের ক্ষোভের সাথে জানালেন যে, মন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত হাজী মো. দানেশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন প্রমুখকে মার্কিনের চাপে মন্ত্রী করা যাচ্ছে না। (তিন জনই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য) ফলে আওয়ামী লীগের থেকে খয়রাত হোসেন (খাদ্য), শেখ মুজিবর রহমান (শ্রম ও শিল্প), আব্দুর রহমান খান, মশিউর রহমান প্রমুখ; কংগ্রেস থেকে মনোরঞ্জন ধর (অর্থ), ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বাস্থ্য) এবং গণতন্ত্রী দল থেকে মাহমুদ আলী (রাজস্ব) প্রমুখকে নিয়ে আতাউর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিদলীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। এখানে প্রকাশ থাকে যে, কমিউনিস্ট পার্টির সদ্য সমাপ্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাজী মোঃ দানেশের নেতৃত্বে গণতন্ত্রী দল এই কোয়ালিশনে যোগ দেয়। তবে পার্টি সিদ্ধান্তের পর আব্দুস সামাদ আজাদ ও মহীউদ্দিন আহম্মদ এক বিবৃতি দিয়ে গণতন্ত্রী দল ছেড়ে সরাসরি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে ছিলেন। পার্টির নির্দেশে যুবলীগের এম, পি, এ, কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহাকেও আওয়ামী লীগে যোগ দিতে হয়।

আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কার্যকরী করতে চেষ্টা নেন। তিনি সকল রাজবন্দিকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন এবং নিজে জেল গেটে গিয়ে রাজবন্দিদের সমবর্ধনা দেন। এই সমবর্ধনের বক্তৃতাকালে তিনি কমিউনিস্ট বন্দিদের উদ্দেশে বলেন, "কে বলে আপনারা দেশদ্রোহী, আপনারাই খাঁটি দেশপ্রেমিক।"

ইতোমধ্যে সীমান্ত প্রদেশের নেতা ডা. খান সাহেবের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে 'কেন্দ্রীয় রিপাবলিকান পাটি' জন্ম লাভ করে। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী পার্টির থেকে ঝানু ব্রিটিশ আমলা স্যার (নাইট) ফিরোজ খান নূনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি অংশ ঐ পার্টিতে যোগদান করে। গভর্ণর জেনারেলের ইঙ্গিতে কেন্দ্রীয় রিপাবলিকান পার্টি, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের সমর্থন

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বরে প্রত্যাহার করে নিলে, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১২ই সেপ্টেম্বর মার্কিনীদের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় কমিটির মাত্র বার জন আওয়ামী লীগের সদস্যের সমর্থন নিয়েই শহীদ সোরওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন।

ভূমি সংস্কার : এদিকে আতাউর রহমান খানের কোয়ালিশ মন্ত্রিসভা একটি 'ভূমিসংস্কার কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশনের সদস্যরা হলেন আইন সভার সদস্যদের পক্ষ থেকে হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, ফয়েজ আহম্মদ, দেওয়ান মাহবুব আলী প্রমুখ কমরেড; কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করেন-যশোরের আব্দুল হক, ফয়েজ আহম্মদ, জালাল, মুদাসছের মুন্সী, কুমিল্লার ইয়াকুব মিঞা প্রমুখ কৃষক নেতা; যুবলীগের পক্ষ থেকে অলি আহাদ, জমিদার শ্রেণীর পক্ষ থেকে মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ শশীকান্ত প্রমুখ জমিদারগণ।'

এই কমিশন সুপারিশ করেন (১) জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ১০০ বিঘা (২) খাসজমি বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি-বণ্টন। (৩) প্রাপ্ত জমি তিন বছরের মধ্যে হস্তান্তর করা যাবে না। তিন বছর পরে কেবল মাত্র সরকারের কাছে বিক্রি করা যাবে; তবে টাকা জোগাড় করে কৃষকরা ফের ঐ জমি কিনতে পারবে। (৪) যতদিন কৃষক ঐ প্রাপ্ত জমির আয় থেকে খাজনা পরিশোধ করতে পারবে না, ততদিন (কমপক্ষে তিন বছর) সে খাজনা বেয়াত পাবে। (৫) কোনো অবস্থাতেই দেনার দায়ে কৃষকের জমি নিরামে বিক্রি করা যাবে না। (৬) জল-মহল বন্দোবস্তর নীতি হবে "জাল যার, জলা তার" ভিত্তিতে। (৭) ইজারা প্রথা বাতিল করে, বাজারের দোকানদারদের ভোটে নির্বাচিত কমিটির হাতে ইহা ন্যাস্ত হবে। এই কমিটি বাজারের আয়ের $\frac{১}{৪}$ অংশ বাজার উন্নয়নের কাজে ব্যয় করবে এবং বাকি অংশ সরকারি খাতে জমা দেবে। সরকার এই খাত থেকে বাজার উন্নয়নে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্ধ দেবে।

শ্রমিক সংগঠন ঃ ১৯৫৫ সনে পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠার পরে শ্রমিক নেতারা অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু পুলিশের বাধার সম্মুখে তা বাধাগ্রস্থ হতে থাকে। ১৯৫৬ সনের আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভা প্রদেশের কিছুটা গণতান্ত্রিক অবস্থার সৃষ্টি করেন। এসময় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে একটি প্রকাশ্য শ্রমিক ফ্রন্ট সংগঠন গড়ে তুলতে কাজশুরু করে। এই টিমে ছিলেন হাবীব, ননী, শফি হোসেন খান, জামিল, লালমিয়া, ফজলু প্রমুখ কমরেডগণ। পরে চট্টগ্রাম ও খুলনাতেও আঞ্চলিক শ্রমিক টিম গঠিত হয়। চট্টগ্রামের টিমের কমরেডরা হলেন চৌধুরী হারুন অর রশীদ, দেকেন শিকদার, আবুল বাশার, শফি উদ্দিন প্রমুখ।

www.pathagar.com

এসময় নারায়ন গঞ্জের লক্ষী নারায়ণ ও চিত্তরঞ্জন মিল ছাড়াও আদমজী মিলের জন্ম হয়েছে এবং প্রদেশে নতুন নতুন মিল কারখানা গড়ার জন্য সরকার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে মিলমালিকদের যোগশাজসে পুলিশ বাধা দিতে থাকে। এমনি এক পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ তোয়াহা পুলিশের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের কাছে অভিযোগ করে। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ঢাকার শ্রমিক সংগঠনে পুলিশের বাধা কিছুটা দূর হয়। এসময় নারায়নগঞ্জের জাহাজী শ্রমিকদের নির্বাচনে মোহাম্মদ তোয়াহা-সভাপতি এবং কাজী মহীউদ্দিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

অতঃপর শ্রমিক আন্দোলনকে বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকার সকল অঞ্চলের শ্রমিক নেতা-কর্মীদের একটি সভা শহীদ পার্কে (বাহাদুর শাহপার্কে) অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রমিক নেতারা বক্তৃতাকালে কাজী মহীউদ্দিন ও মো. তোয়াহাকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি শ্রমিক ফেডারশনের ঘোষণা দেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শে ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন গঠিত হয় এবং মোহাম্মদ তোয়াহাকে এই ফেডারেশনের সভাপতি এবং কাজী মহীউদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোরওয়ার্দী মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করলেও ভারতীয় সম্প্রাসারণ বাদীদের হাত থেকে পাকিস্তানকে বাঁচায়ে রাখতে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি গণচীনের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাই ২২ শে অক্টোবর (১৯৫৬) সরকারী সফরে চীনে যান এবং তাঁর আমন্ত্রণে গণচীনের প্রধানমন্ত্রী কমরেড চৌ এন লাই (ঝাও এন লাই) পাকিস্তান সফরে আসেন।

এসময় (অক্টোবরে) ব্রিটিশ সরকার, ইস্রাইলী, মার্কিনী ও ফরাসি সরকারের সমর্থন নিয়ে মিসরের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। কারণ মিসর জুলাই মাসে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলী, মিসরের শাসনকর্তা যেদিব ঈসমাইলের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ স্টার্লিং পাউন্ড মূল্যের খালের শেয়ার কিনে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা এই ফলের মালিক হয়ে বসে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মিসর নীল নদের উপর আসোয়ান বাঁধ (হাইড্যাম) নির্মাণের পরিকল্পনা করে এবং বিশ্বব্যাংক এই বাঁধ নির্মাণে পুঁজি বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করে। ফলে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের বাঁধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সুয়েজ খাল জাতীয় করন করতে বাধ্য হন।

যাই হোক, ইঙ্গো-ফরাসি শক্তিদ্বয়, মিসরে সশস্ত্র আক্রমণ করলে ঢাকার নাগরিকজীবনে এর বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ৩রা নভেম্বর উত্তেজিত জনতা পুরানা

www.pathagar.com

পল্টনের ব্রিটিশ তথ্যকেন্দ্রটি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। মিসরের এই সংকট কালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং দলীয় মুখ্য মন্ত্রী আতাউর রহমান খান এক বিবৃতির দ্বারা মিসরের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। মৌলানা ভাসানী ৯ই নভেম্বরকে 'মিশর দিবস' ঘোষণা করেন এবং প্রাদেশিক সরকার মিসর দিবসকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা জারি করে। মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ, প্রাদেশিক সরকারের কাছে মিশরে সেচ্ছাসেবক-বাহিনী পাঠাতে দাবি করে। ফলে প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত একটি সেচ্চাসেবক-বাহিনী প্রস্তুত করেন।

এদিকে সুয়েজ সমস্যার উপর আলোচনার জন্য ১২ই নভেম্বর কলম্বো (নিরপেক্ষ) শক্তি সমূহ দিল্লীতে একটি সম্মেলন ডাকে এবং একই সময়ে মার্কিনী গং তেহরানে বাগদাদ প্যাট কাউন্সিল সভা ডাকে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোরওয়ার্দী, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে সাথে নিয়ে তেহরানের বৈঠকে যোগদান করেন। দেশে ফিরে প্রধামন্ত্রী সোরওয়ার্দী এক বিবৃতিতে বলেন যে, সুয়েজে ইঙ্গো-মার্কিন-ফরাসি সরকারের স্বার্থ রয়েছে। সুতরাং তাদের সেই স্বার্থ রক্ষার অধিকার তাদের আছে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান, প্রধাত্রীর এই বিবৃতিকে সমর্থন করেন। অতঃপর প্রদেশিক আওয়ামী লীগে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

১৯৫৭ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে (টাঙ্গাইলে) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলনা ভাসানী, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান শহীদ সোরওয়ার্দীর অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা করে এক জালাময়ী ভাষণ দেন। এই ভাষণে মৌলনা কেন্দ্রীয় সরকারকে সাবধান করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন না দিলে এবং সামরিক ও বেসামরিক চাকরিতে, শিল্পে বানিজ্যে, কৃষিতে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংখ্যাসাম্য নীতি সঠিকভাবে পালন না করলে, পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলায়কুম' বলিবে তথা পাকিস্তান থেকে পৃথক বা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। লীগে কর্মরত কমিউনিস্ট কর্মীরা মৌলনার ঘোষণার সাথে একত্বতা প্রকাশ করেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা সম্মেলনের পূর্বেই মৌলনাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি প্রস্তাব তৈরি করে দেন এবং হুজুর (ভাসানী) এর ভিত্তেতে বক্তব্য রাখেন।

দলীয় কাউন্সিল অধিবেশনে পরাজিত হয়ে, সোরওয়ার্দী তখনই হেলিক্যাপ্টার যোগে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং তাঁর নির্দেশে এস. এম. হলে এক ছাত্র–সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ছাত্র সভায় সোরওয়ার্দী ঘোষণা করেন জিরো+জিরো = জিরো থিউরী। তিনি বললেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জিরো শক্তি, এর পাশে এক বসালে দশ হবে এবং সেই এক শক্তি

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই তিনি মার্কিনীদের পক্ষে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছেন। শেখ মুজিব পার্টি প্রধানের এই পররাষ্টনীতির সমর্থন দান করেন।

সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তি বিরোধী ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষের ও বিপক্ষের মধ্যে মতবিরোধ আওয়ামী লীগে দিন দিনই প্রকট হয়ে উঠে। দলীয় প্রধান সোরওয়ার্দী এবং প্রাদেশিক সাধারণ সাম্পাদক শেষ মুজিব গ্রুপের মার্কিন তোষণ নীতিতে প্রাদেশিক সভাপতি মৌলনা ভাসানী ক্ষুব্ধ হয়ে ১৮ই মার্চ সংবাদপত্রে এক বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি থেকে পদত্যাগ করেন।

মৌলনা ভাসানীর পদত্যাগ পত্রটি জনাব অলী আহাদ সংবাদপত্রে পৌছাইয়া দিয়া ছিলেন। তাই ৩০ শে মার্চ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির সভায় তাঁকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেওয়া হয়। ওয়াকিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের (১৪-৯) বিরুদ্ধে নিম্নে লিখিত সদস্যগণও পদত্যাগ পত্র পেশ করেন—

(১) কোষাধ্যাক্ষ, ইয়ার মোহাম্মদ খান(তাঁর ব্যক্তিগত অর্থে দলীয় পত্রিকা–ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠিত),(২) প্রচার সম্পাদক, আব্দুল হাই,(৩) শ্রম সম্পাদক, আব্দস সামা (এম. পি. এ.) (৪) মহিলা সম্পাদিকা, সেলিনা বানু (এম. পি. এ.) (৫)বগুড়া জেলা সভাপতি, আকবর হোসেন আখন্দ (এম. পি. এ.) (৬) রংপুর জেলা সভাপতি, দবির উদ্দিন আহম্মদ (এম. পি. এ.)(৭) চট্টগ্রামের অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন আহম্মদ (এম: পি. এ.) (৮)সিলেটের হাবিবুর রহমান (এম. পি. এ.) (৯) হাতেম আলী খান (এম. পি. এ.)। ২১শে মে ওয়াকিং কমিটির পরবর্ত্তী বৈঠকে এই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

১লা জুন মৌলনা ভাসানী পূর্ব পাকস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে অনশন শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে সোরওয়ার্দী তাঁর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সাম্মেলনে পাশ করারবার জন্য শেখ মুজিবকে নির্দেশ দেন। ফলে ১৩ই জুন আরমানীটোলা ছবিঘরে (শাবিস্তান হলে) এবং ১৪ই জুন গুলিস্তান হলে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা, কমরেড আব্দুস সামাদ আজাদ ও কমরেড মহীউদ্দিনের বক্তব্য পেশ করার কথা থাকলেও শহীদ সাহেব সুকৌশলে তা বাতিল করে নিজে একাই ভাষণ দিতে থাকেন এবং কর্মী মহলে শ্লোগান তোলা হয়—আওয়ামী লীগে কমিউনিস্টের স্থান নাই, রুশ–ভারতের দালালরা বেরিয়ে যাও, ফরেন পলিসি জিন্দাবাদ, সোরওয়র্দী জিন্দাবাদ ইত্যাদি। সভায় শীদ সাহেব ঘোষণা করেন যে, যাঁরা তাঁর পররাষ্ট্রনীতি মানবে না, তাঁরা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যাবে। ভোটাভুটিতে তোয়াহা গ্রুপ মাত্র ৪৭টি ভোট পান। তাই সাথে সাথেই মোহাম্মদ তোয়াহ ও অলী আহাদ, আওয়ামী লীগের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

অধিবেশন শেষে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা সোরওয়াদী ঘোষণা করেন যে,

www.pathagar.com

প্রদেশে ও কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাশীন; ৫৬ সনের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮% ভাগ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আওয়ামী লীগ কি?আমিই লীগ, আমিই গঠনতন্ত্র"।

ন্যাপ গঠন

মৌলনা ভাসানী, মোহাম্মদ তোয়াহা এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদকে ডেকে নিয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার জন্য পরামর্শ করেন। এই বৈঠকের সিদ্ধান্তে মোহাম্মদ তোয়াহাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সমমনা নেতাদের ঢাকাতে ডেকে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোহাম্মদ তোয়াহার টেলিগ্রাম পেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাবের জননেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন; সি. আর আসলাম, মাহমুদ আলী কাসুরী; সীমান্ত গান্ধী (লালকোর্তা নেতা) আব্দুল গাফফার খান; বেলুচগান্ধী আব্দুস সামাদ আচাকজাই; সিন্ধুর জননেতা জি. এম. সৈয়দ, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদল হক ওসমানী প্রমুখ ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন। অতঃপর ১৫ই ও ১৬ই জুন দুইদিন ব্যাপী এই নেতা-কর্মীদের বৈঠকে জাতীয় ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৫ ও ২৬শে জুলাই (১৯৫৭) সদর ঘাটের রুপমহল সিনেমা হলে নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে গঠিত হয়–পাকিস্তান ন্যালনাল আওয়ামী পার্টি (এন.এ. পি.)। এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে কমরেড হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও রাজস্বমন্ত্রী মাহমুদ আলী নেতৃত্বে পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল যোগদান করে। সম্মেলনে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি এবং মাহমুদ আলী কাসুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের পচিশ জন সদস্য জি. এম. সৈয়দের নেতৃত্বে এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অধ্যাপক আহাছাব উদ্দিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ, মহীউদ্দিন আহমম্মদ, আব্দুস সামাদ আজাদ প্রমুখও অংশ নেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল নেতা কর্মীদের ন্যাপে ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে আওয়ামী লীগ গদি হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। তাই ন্যাপ গঠন শেষে বিকেলের পল্টন ময়দানে ন্যাপের প্রথম জনসভায়, সোরওয়ার্দীর ভাবশিষ্য শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ফকিরা পুলের গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে, জনসভা ভেঙে দিতে চেষ্টা করে। এতোসত্ত্বেও

www.pathagar.com

ন্যাপের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণ সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরে অবস্থান নিতে শুরু করে। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার পরোক্ষ নির্দেশে রিপাবলিকান পার্টি সোরওয়ার্দী উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভেঙে পড়ে। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ১৬ই অক্টোবর হোসেন শহীদ সোরওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর মুসলিম লীগ নেতা আই. আই. চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ মজদুর ফেডারেশনের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন— সভাপতি: কমরেড তোয়াহা, সহ-সভাপতি: এডভোকেট এম. এ. জব্বার (খুলনা) এ, আর সুন্নামাত (ঢাকা) হারুনুর রশিদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম); সাধারণ সম্পাদক কাজী মহিউদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক; হাবিবুর রহমান (টাকু) প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী চুন্দ্রীগড় ১৯৫৮ সনের ফেব্রুয়ারিতে পৃথক সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। এদিকে ন্যাপ ও অন্যান্য রাজনৈতকি দল জাতীয় পরিষদে যুক্ত নির্বাচনের দাবিতে দেশব্যপী আন্দোলন শুরু করে। প্রবল জনমতের চাপে রিপাবলিকান পার্টি যুক্ত নির্বাচনের পক্ষ সমর্থন করে। ফলে ১১ই ডিসেম্বর চুন্দ্রীগড় পদত্যাগ করেন। আর রিপাবলিকান পার্টির নেতা ফিরোজ খান নূন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সনের ৩০শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্ণর শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুক হক, 'মুখ্যমন্ত্রী আতউর রহমান খান সরকারের প্রতি সংখ্যা গুরু সদস্যের আস্থা নাই' কারণ পদচ্যুত করে, নিজদলীয় নেতা আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহবান জানান। প্রকাশ থাকে যে, ইতোপুর্বে বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় বাজেট তথা অর্থবিল পাশ করাতে ব্যর্থ হন। এদিকে শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রীকে হুশিয়ার করে দেন যে, শেরে বাংলাকে ক্ষমতাচ্যুৎ না করলে তাঁর দলীয় ১৩ জন কেন্দ্রীয় সদস্যে সমর্থন প্রত্যাতার করবেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূন ৩১শে মার্চ, শেরে বাংলাকে গভর্ণর পদ থেকে অপসারণ করেন। ১লা এপ্রিল প্রাদেশিক চীফ সেক্রেটারি অস্থায়ী গভর্ণরের দায়িত্ব পেয়েই আবু হোসেন সরকারকে পদচুত্য করে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন।

১৮ই জুন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে ন্যাপের ৩৩ জন সদস্য নিরপেক্ষ থাকেন, ফলে আতাউর রহমান খান পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পদত্যাগে বাধ্য হন এবং ১৯শে জুন আবু হোসেন সরকার ফের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেন। কিন্তু ২২শে জুন ন্যাপের ২৮ জন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দেন। অতঃপর ২৫শে জুন থেকে প্রদেশে প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তিত হয়। ২২শে জুলাই ফের আতাউর রহমান খাঁন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেন।

www.pathagar.com

২৩শে সেপ্টম্বর পূর্ব পাকিস্তান আইনপরিষদে ফের বাজেট পাশ করাতে তৎপর হয়। অশাসক দল (আওয়ামী লীগ) যে কোন প্রকারে বাজেট পাশ করাবার জন্য সমস্ত ব্যবস্তা পাকা করে। তারা 'আর্মস গার্ড-এর আবরণে গুণ্ডাবাহিনী আইন সভার কক্ষে ঢুকিয়ে রাখে। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী অর্থ বিলটি পাশ করারবার জন্য নিজের নিরপেক্ষতা ভেঙে বিরোধী দলের উপর চাপ প্রয়োগ করাতে, সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তর্ক ও হাতাহাতির এক পর্যায়ে আর্মস গার্ড নামধারী গুণ্ডাদের ব্যবহারিত সাইকেলের চেইনের আঘাতে বিরোধী দলীয় সদস্যরা আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন। ভারপ্রাপ্ত স্পীকারকেও আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু ২৬শে সেপ্টেম্বর স্পীকার সেখানে মারা যান।

এ সময় পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনীতি মূল্যায়ন করলে দেখা যা যে, কেন্দ্রে মার্কিন পন্থী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা হারিয়েছে এবং সেখানে রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতা শীন। এই সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ চারটিতেও মার্কিন বিরোধীরাই ক্ষমতাশীলন। তখন একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান শাসন ক্ষমতায় মাকিনপন্থী আওয়ামী লীগ। তবে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে তারাও মূমুর্ষ। এই অবস্তায় আগামী (১৯৫৯) সাধারণ নির্বাচনে মাকিন পন্থী আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা কম। এ ছাড়া খাঁন আব্দুল কাইয়ুম খাঁনের নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগও মার্কিন বিরোধী ভূমিকা পালন করছে। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক নেতাদের উপর ভরসা না করে সামরিক আমলাদের (অফিসারদের) উপর নির্ভর করে এদেশে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চেষ্টা লয়। তাঁরা গভর্ণর জেনারেল মীর্জাকে দিয়ে সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করে, সাদারণ নির্বাচন বানচালের ব্যবস্তা করে। মার্কিন ষড়যন্ত্রে গভর্ণর জেনারেল মে. জে. ইস্কান্দার মীর্জা, ৭ই অক্টোবর মধ্যরাতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান মে. জে. আয়ুব খাঁনকে প্রধান সামরিক শাসন কর্তা নিয়োগ করেন।

সামরিক শাসক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন অবসরপ্রাপ্ত আই. জি. পি. জনাব জাকির হোসেনকে (পশ্চিম পাকিস্তানে কলাবাগের নবাবকে)। নতুন গভর্ণর জাকির ১২ই অক্টোবর মার্কিন বিরোধী মওলানা ভাসানীসহ অধিকাংশ ন্যাপ নেতা-কর্মীদের কারাগারে আটক করে। একই দিনে আতা-মন্ত্রিসভার দুর্নীতি দমন মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, নিজেই দুর্নীতির দায়ে কারাবন্দি হন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ২০শে অক্টেবর বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে শেখ মুজিবকে নিরাপত্তা বন্দি করা হয় এবং তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ই অক্টোবর মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মৌলানা ভাসানীকে ১৯৫৯ সালের ৬ই অক্টোবর থেকে ১৯৬২ সারের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত ধানমন্ডির একটি সরকারি বাড়িতে সপরিবারে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কমরেড তোয়াহা, অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতাদের সাথে আত্মগোপন করেন। এসময় পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন শাসনকর্তা ছিলেন— মেজর

www.pathagar.com

জেনারেল ওমরাও খাঁন। জেনারেল আয়ুব খাঁন, পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে, ২৪শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মীর্জা, আয়ুব খাঁনকে ১২ সদস্যের মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এবং লে. জে. মূসাকে জেনারেল পদে উন্নীত করে, সেনাপ্রধান নিয়োগ করেন। রাতে আয়ুবপন্থী লে. জে. আজম খাঁন; লে. জে. কে, এম , শেখ; লে. জে. ডব্লিউ এ, বাকি— প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে পদত্যাগে বাধ্য করে সস্ত্রীক লন্ডনে পাঠায়ে দেন।

সামরিক সরকার দুর্নীতি , কর্মবিমুখতা, অদক্ষতা ও শৃঙ্খা বিরোধী অপরাধে, পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১২ জন অফিসার, ৮৪ জন প্রথম শ্রেণীর (উচ্চ পদস্থ) চাকুরে এবং ২৫০০ জন সরকারি (নিম্ন পদস্থ) কর্মচারীকে বরখাস্ত করে। পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন আডিন্যান্স জারি করে মন্ত্রী ও এম. পি. এ.-দের বিচারে ব্যবস্তা করে এবং এই বিচারে অপরাধীদের ১৯৬৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সদর দফতর ছিল রাওয়ালপিন্ডিতে। প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁন, পাকিস্তানের রাজধানীও করাচি থেকে রাওয়াল পিন্ডিতে স্থানান্তরিত করেন। তিনি ১৯৫৯ সনের ডিসেম্বরে সমগ্র পাকিস্তানে ইউনিয়ন বোর্ড (কাউন্সিল) নির্বাচন দেন।১৯৬০সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যদের আস্তা (হ্যাঁ বা না) ভোটের জোরে তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলে দাবি করেন।

প্রোসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৬০ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি জেনারেল খাঁ দেশ উন্নয়নের জন্য কতকগুলো কমিশন ও কমিটি গঠন করেন। এগুলো হলো:– (১) দেশের সংবিধান প্রনয়নের জন্য 'কনস্টিটিউশন কমিশন', (২) ভোটাধিকারে মতামতের জন্য 'ফ্রেঞ্চাইজ কমিশন', (৩) খাদ্য ও কৃষির সুপারিশের জন্য ' ফুড এন্ড এগ্রিকালচার কমিশন' (৪) ভূমি ব্যবস্থার জন্য 'ল্যান্ড রিফরম কমিশন' (৫) শিক্ষার জন্য এডুকেশন কমিশন; (৬) চিকিষসার জন্য ' মেডিকেল রিফরমস কমিশন', (৭) সংবাদ পত্রের জন্য ' প্রেস কমিশন (৮) ব্যাংকের জন্য ক্রেডিট ইনকোয়ারী কমিশন; (৯) সরকারি চাকুরেদের জন্য ' পে এন্ড সার্ভিসেস কমিশন; (১০) বিজ্ঞানের জন্য সাইন্টিফিক কমিশন;(১১) বিয়ে ও পরিবারের জন্য 'মেরিজ এন্ড ফেমিলি লজ কমিশন'(১২) সমাজিক বিষয়ে 'সোস্যাল ইভিলস ইরিডিকেশন কমিশন,'(১৩) দ্রব্যমূল্য বিষয়ে "প্রাইম কমিশন" (১৪) পাট বিষয়ে " জুট ইনকোয়রী কমিশন' (১৬)বস্ত্র বিষয়ে টেক্সটাইল কমিশন (১৭) সমুদ্র বানিজ্য বিষয়ে মেরিটাইম কমিশন (১৮) জাতীয় আয় বিষয়ে 'ন্যাশনাল ইনকাম কমিশন', (১৯) আইন বিষয়ে, 'ল রিফরমস কমিশন; (২০) সিনেমা বিষয়ে 'ফিল্ম ইনকোয়ারী কমিটি; :(২১) খেলাধুলা বিষয়ে স্টোর্টস, কালচার, ইউথ মুভমেন্ট এন্ড আর্ট ইনকোয়ারী কমিটি; ইত্যাদি।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসক ও বেসামরিক গভর্ণরের ক্ষমতার দ্বন্দে জাকির হোসেনকে বিদায় নিতে হয় এবং ঐ পদে নিযুক্ত হন — লে. জে. আযম খাঁন। ১৯৬০ সালের ১০ই ও ৩১শে অক্টোবর পর পর দুটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সময় আযম খাঁনের ত্রাণ তৎপরতায় বাঙালিরা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন।

করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত জনাব হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী, সামরিক সরকারে বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জোট বাধতে উৎসাহিত করেন। ফলে ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাঁকে করাচিতে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মৌলনা ভাসানীসহ অনান্য প্রতিবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা জেলে বন্দি। কিন্তু ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা একটি সভায় মিলিত হয়ে ৬ ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারি সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। ফলে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনিদিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

১লা মার্চ আয়ুব খাঁন নুতন সংবিধান জারি করেন এবং ঐ সংবিধান অনুসারে ২৮শে এপ্রিল জাতীয় ও ৬ই মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এপ্রিল মাসে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আযম খাঁন পদত্যাগ করেন এবং গোলাম ফারুক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হয়ে আসেন। ৮ই জুন রাওয়াল পিন্ডিতে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে। ৮ই জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভার বক্তারা মৌলনা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফফার খাঁন, আব্দুস সামাদ খাঁন আচাকজাই, আল্লামা মাশরেকীসহ বিনা বিচারে বন্দি জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবি জানান। আয়ুব খাঁন ১৪ই জুলাই রাজনৈতিক দল বিধি প্রণয়ন করেন। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তানে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবির প্রেক্ষিতে ১৯শে আগস্ট শহীদ সাবকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৬ শে অক্টোবর গৃহবন্দি মৌলানা ভাসানী, পাটের ন্যায্য মূল্য, মোহাজের পুর্নবাসনও বন্যাকবলিত দুর্গতদের খয়রাতি সাহায্যের দাবিতে অনশন শুরু করেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দিলে ২৭শে অক্টোবর তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৮শে অক্টোবর গভর্ণর স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করলে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী আব্দুল মোনায়েম খাঁনকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। ৩রা নভেম্বর মৌলনা ভাসানীকে অন্তরীণ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর চীন–ভারত যুদ্ধ বাধে। চীনারা ভারতের উত্তর–পূর্ব সীমান্ত নেফা এলাকা দখল করলে, ভারতীয় সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং ২৬শে অক্টোবর সমগ্র ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতে হাসপাতালে শহীদ সোরওয়ার্দী মারাযান।

১৯৬৩ সালের ২২শে জুন রাওয়াল পিন্ডিতে আয়ুব–ভাসানী এক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। ২৮শে ও ২৯শে আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সাংগঠনিক কমিটির বৈঠক

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ৩/৮ , লিয়াকত এভিনিউ (জনসন রোড) এবং ৩০শে, ৩১শে আগস্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকাতে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)–এর সাংগঠনিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১লা অক্টোবর মৌলনা ভাসানী সরকারি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে গণচীন সফরে যান এবং স্বদেশে ফিরে আয়ুব সরকারকে সমর্থন করেন।

১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি শেখ মুজিবর রহমান, ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পার্টি পুনর্জ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৮শে ২৯শে ফেব্রুয়ারি ও ১লা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাপের সাংগঠনিক কমিটির সভায় পার্টিকে পুনর্জ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২২শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কনভোকেশনে গোলযোগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত ছাত্রনেতাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করে শাস্তি দেন:— রাশেদ খাঁন মেনন, কে. এম. ওবায়দুর রহমান, এ. কে. বদরুল হক ও সওগত আলমকে—পাঁচ বছরের জন্য; নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ার আলী, আলী হাদার খাঁনকে–তিন বছরের জন্য; আব্দুল করিম, আব্দুর রাজ্জাক মিঞা, সিরাজুল আলম খাঁন, ফেরদৌস কোরেশী, হুমায়ুন কবির, মনসুরুদ্দিন আহমদ, গিয়াস উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ মতিয়ুর রহমান, কাজী মোজাম্মেল ইসলাম, আতিকুর রহমান, কামাল উদ্দিন শিকাদর ও জাকি আহমদকে দুই বছরের জন্য বহিস্কার করা হয়। কিন্তু জাকি আহমদ ও আহমদ ফারুকের রীট আবেদনে ঢাকা হাই কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্র বহিস্কার আদেশ নাকচ ঘোষণা করেন।

২০শে জুলাই ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে চারদিন ব্যাপী এক বৈঠকে নয় দফার এক কর্মসূচি ভিত্তিক গঠিত হয়, সম্মিলিত বিরোধী দল। এতে অংশ লয় কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামী। এই জোট ১৭ ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর করাচি বৈঠকে ফাতেমা জিন্নাহকে তাদের মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বলে ঘোষণা করে ।

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেনারেল আয়ুব খাঁন বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্র সংগঠনের সভাপতি রাশেদ খাঁন মেননের নেতৃত্বে এবং ইকবাল হলের ছাদে সাধারণ সম্পাদিকা বেগম মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন দুটি থেকে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ– পিকিং পন্থী এবং মতিয়া গ্রুপ– মস্কোপন্থী নামে সংগঠনটি দ্বিধাবিভক্তি হয়ে যায়।

মার্চ মাসে জাতীয় পরিষদে এবং এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে

www.pathagar.com

কনভেনশন মুসলিম লীগ তথা সরকারি দলের সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রার্থীরাই বিজয়ী হন।

ভারত দাবি করে যে, পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত মোজাহিদ বাহিনী' ভারত অধিকৃত কাশ্মির রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এই দাবিকে কেন্দ্র করে ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনা বাহিনী পাকিস্তান আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান ধ্বংসের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। আমরা জানিয়ে, ১৯৬২ সালে সংগটিত চীন-ভারত যুদ্ধের সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পাক–ভারতের যৌথ সেনা আক্রমনে গণচীনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায় পাকিস্তান অংশগ্রহণ না করায়, মার্কিনীদের ইন্ধনে ভারত পাকিস্তান ধ্বংস করতে এই যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। কিন্তু পাকিস্তানের বন্ধু গণচীন, এসময় ভারত ও আমেরিকা সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, যদি পাকিস্তানের কোনো বড় শহর ভারত দখল করে, তবে গণচীন তার নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। ফলে ২০শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ২৩শে সেপ্টম্বর ভোরবেলা থেকে তা কার্যকরী হয়। যুদ্ধ শেষে পশ্চিম পাকিস্তানের মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মো আয়ুব খাঁন ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং ঢাকার গভর্নর হাইসে (বঙ্গ ভবনে) পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতি নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। মার্কিনীরা পাকিস্তানকে আয়াত্বে রাখার জন্য এক নতুন কৌশল গ্রহণ করে। সি আই, এর নিয়ন্ত্রিত এদেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে সাত দফার একটি দাবি নামা তৈরি করে জনাব খায়রুল কবীরের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তান মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনকে প্রদান করেন— এই বৈঠকে প্রেমিডেন্টকে দেওয়ার জন্য।

১৯৬৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলেক্সী কোসিগিনের আমন্ত্রনে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহদুর শাস্ত্রী, রায়িার তাসখন্দ শহরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হয়। ১০ই জানুয়ারি উভয় দেশের সরকার–প্রধান তাসখন্দ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এই তাসখন্দ চুক্তির বিরোধী হয়ে পড়ে। ফলে সেখানকার রাজনীতিবৃন্দ ঐ ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে দেশের রাজনীতিবিদদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান যোগদান করেন এবং পাকিস্তানের সংবিধানিক সমস্যা সমাধানের জন্য সি. আই এ লিখিত ৭ দফা কর্মসূচি থেকে শেষ দফাটি বাদ দিয়ে এবং অন্যান্য দফায় কিছু সংশোধন করে, ছয়দফা কর্মসূচি প্রস্বাব উত্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফলে ১১ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব লাহোর সম্মেলন ত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে এসে সাংবাদিকদের

www.pathagar.com

কাছে তার ছয়দফা কর্মসূচি প্রকাশ করেন। বস্তুত মার্কিনীরা ছয়দফার মাধ্যমে পাক সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে, সরকারকে নিজেদের আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে।

৮ই মার্চ প্রেসিডেন্ট আয়ুব জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত ভাষনে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ফলে ৩০শে এপ্রিল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (N,D,F) -এর নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে ঐ মতের বিরুদ্ধে ৭ দফার একটি কর্মসূচি তৈরি করেন। ন্যাপ-এন. ডি. এফ.–এ অংশগ্রহণ করে নাই। ফলে সরকার দলীয় নেতা কমরেড তোয়াহা, অধ্যাপক আসাহাবুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রমুখের উপর থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে লয়। এসময় গতিশীল শ্রমিক নেতারা গঠন করেন 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন'। অত্র সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন – কমরেড তোয়াহা, সম্পাদক- সিরাজুল হোসেন খাঁন, যুগ্ম সম্পাদক– হাবিবুর রহমান(টাকু) প্রমুখ।

ছয় দফা কর্মসূচি বাপক প্রচারের জন্য আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের বিভিন্ন শহরে জনসভা শুরু করে। ৮ই মে নারায়ন গঞ্জ জনসভার পর দেশরক্ষা আইনের ৩৪ ধারা বলে ঐ রাতে শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ৭ই জুন সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের ডাক দেয়। এই হরতালে পার্টি কর্মীরা বিশেষ কোনো ভূমিকা না রাখতে পারলেও কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন,' আলতাফ আলী–ফয়েজ আহমদের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তানে ফেডারেশন অব লেবার' এবং কমরেড আবুল বাশারের নেতত্বে 'চটকল শ্রমিক ফেডারেশন' বিভিন্ন শিল্প এলাকার হরতাল সফল করতে বিশষ ভূমিকা পালন করে। হরতাল পালনের সময় তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনু মিয়া (সিলেট). আজাদ (নোয়াখালী) সহ ১০/১২ জন শ্রমিক শহীদ হন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খাঁনের দমন নীতির ভয়ে আওয়ামী লীগ, শ্রমিক হত্যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ না বরলেও পার্টির পত্রিকায় তোফাজ্জাল হক (মানিক মিয়া) সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। ফলে সরকার ১৬ই জুন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকপাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে উহা বন্ধ করে দেয়।

ইতোমধ্যেই 'গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মির সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাক,-ভারত যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা' ও 'তাসখন্দ মান্তি চুক্তি' সম্পাদনের বিপক্ষে জনমত গটনের জন্য প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁন তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিক্কার আলী ভুট্টোকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন । ফলে ১৮ই জুন ভুট্টো সাহেব চিকিৎসার অজুহাতে পদত্যাগ করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে মি. ভূট্টোর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল.)

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম (১৯৫৬) কংগ্রেসে কমরেড ক্রুশ্চেব, সমাজতান্ত্রিত রাশিয়ার বিনির্মাতা প্রাক্তন পার্টি ও রাষ্ট্রপ্রধান কমরেড ষ্টালিনের "দুই শিবির" (পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী) নীতি বাতিল করে "শান্তির এলাকা" সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেন। তিনি "শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ" মতার্দশ গ্রহণ করলে প্রথমে আল বেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরে গণচীনসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মার্কসবাদী পাটিগুলো ক্রুশ্চেভ গংকে লেনিনবাদের বিকৃত দক্ষিণপন্থী 'সংশোধনবাদী' বলে সমালোচনা করতে থাকে। কমরেড ক্রুশ্চেভকে ক্ষমতা চ্যুৎ করে কমরেড লিউনিদ ব্রেঝনেভ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন এবং বিশ্বব্যাপী মতার্দশের সমালোচনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা গণচীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায় এবং রুশ পার্টি সংশোধনবাদী পথে ধনতন্ত্রের দিকে পা বাড়ায়।

বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তি আসে। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতেও মতার্দশের ক্ষেত্রে বিতর্ক উঠে। কিন্তু এদেশের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রায় সব সদস্যই রুশ পার্টির নীতিকে সঠিক বলে মেনে লয়। ফলে ১৯৬৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর নামে মস্কো লাইন' পাশ হয়ে গেলে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে নোয়াখালীর কমরেড তোয়াহা এবং চট্টগ্রামের কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার বের হয়ে এসে যশোরের কমরেড আব্দুল হক, খুলনার কমরেড নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রামের কমরেড শুধাংশু বিমল দত্ত এবং সিলেটের কমরেড শর্মাকে নিয়ে চীন পন্থী একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন। এই সাংগঠনিক কমিটির নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের পার্টির সব কয়টি জেলা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৭ সালে সিলেটে এই চীনপন্থী কমিউনিস্টরা গোপনে জাতীয় কংগ্রেসে গঠন করেন 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম, এল)'। এসময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী থাকাতে পার্টি নেতা কর্মীরা প্রকাশ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাতে থাকেন।

আয়ুবের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে জনগণকে মুক্ত করতে ন্যাপ ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দল জাতীয় ভিত্তিক একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করে। এই প্রেক্ষাপটে ৩০শে এপ্রিল (৬৭) আতাউর রহমান খাঁনের বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বর্গকে নিয়ে গঠিত হয় 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি, ডি, এম)'। জাতীয় গণতন্ত্রিক ফন্টের নুরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খাঁন; পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম

www.pathagar.com

লীগের মমতাজ দৌলতানা, তোফাজ্জল আলী, খাজা খায়ের উদ্দিন; জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের তোফায়েল মোহাম্মদ, আব্দুর রহিম, গোলাম আযম; পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নসরুল্লাহ খাঁন, আব্দুস সালাম খাঁন, গোরাম মোহাম্মদ খাঁন লুন্দখোর; পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পাটির- চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ফরিদ আহম্মদ, এম, আর, খাঁন। এই পি. ডি. এম. সরকার বিরোধী আট দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

কিন্তু পি. ডি. এম. গঠন প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে ২৩শে আগস্ট পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এডহক কমিটি'। এই কমিটির সভাপতি মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ (পাবনা), সাধারণ সম্পাদক মুজিবর রহমান (রাজশাহী) এবং মশিউর রহমান (যশোর), রওশন আলী (যশোর), সাদ আহম্মদ (কুষ্টিয়া), মনসূর আলী (পাবনা) প্রমুখ সহ ২৪ জনকে নিয়ে গঠিত হয়। এরা আট দফাপন্থী নামে পরিচিত।

২৭শে আগস্ট অপর এক বৈঠকে গঠিত হয় 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি'। এই কমিটির সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান (ফরিদপুর), সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান (রাজশাহী) এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ময়মনসিংহ) তাজউদ্দিন আহমদ (ঢাকা), শাহ আজিজুর রহমান (কুষ্টিয়া), মিজানুর রহমান (কুমিল্লা), মিসেস আমেনা বেগম (কুমিল্লা), আব্দুল মালেক উকিল (নোয়াখালী), মোহাম্মদ উল্লাহ (নোয়াখালী) প্রমুখ ২৩ জন ব্যক্তি। এরা ছয়দফাপন্থী নামে পরিচিত।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে অপসারিত হয়ে জুলফিক্কার আলী ভুট্টো নভেম্বর মাসে গঠন করেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল। মেনন গ্রুপের ছাত্রনেতা সিরাজ শিকদার ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারি গঠন করেন পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন।

১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি এক সরকারি প্রেস নোটে প্রকাশ করা হয় যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের প্রথম সচিবের যোগসাজসে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে ১৮জন সামরিক ও ১৭ জন বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ। শেখ মুজিব ১৭ই জানুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পেলে, তাঁকে ফের জেলগেট থেকে এই ষড়যন্ত্র মামলা তথা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসেবে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

ন্যাপের মূল চালিকা শক্তি ছিল আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরা। মূল কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হওয়াতে; ন্যাপেও মস্কো-পিকিং মতদ্বৈততা দেখা দেয়। ন্যাপের সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. তোয়াহা পিকিং তথা গণচীনের কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শকে গ্রহণ করেন। ফলে ন্যাপের

www.pathagar.com

মধ্যে দ্বিমত অনুসারীদিগকে ন্যাপের রংপুর কাউন্সিল অধিবেশনে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃত হন। এই বহিস্কৃতরা ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক বৈঠকে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে সভাপতি ও সৈয়দ আলতাফ হোসানকে সাধারণ সম্পাদক করে মস্কোপন্থী ন্যাপ পুনগর্ঠিত করেন।

১৯শে জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে ঢাকা সেনানিবাসে বিশেষ আদালতে বিচার শুরু হয়। আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা সরকারি অত্যাচার এড়াতে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে এবং তখন এই দল নামে মাত্র বেঁচে থাকে। মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে ঢাকার শহরতলীতে দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পন্ন করেন। পার্টি প্রধান কম. মনি সিং এ সময় জেলে বন্দি থাকাতে কংগ্রেসে কমরেড বারিণ দত্ত ওরফে ছালাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে পূণঃনির্বাচিত হন। বছরের শেষ দিকে এই পার্টির নির্দেশে মস্কো ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দক্ষিণপন্থী দলের বিরোধী একটা ঐক্যফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করে।

এসময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো সমর্থিত ছাত্ররা আন্দোলনে এগিয়ে আসে। ৭ই নভেম্বরে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং এখানে পুলিশের গুলীতে একছাত্র মৃত্যুবরণ করে। ১৬ই নভেম্বর পেশওয়ার জনসভার বক্তৃতা কালে প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে খুন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৩ই নভেম্বর জুলফিক্কার আলী ভুট্টোকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা প্রধান চারটি ছাত্র সংগঠনে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো (১) সরকার সমর্থিত এন. এস. এফ. এবং (২) ই. পি. এস. ইউ মেনন গ্রুপ (ভাসানী ন্যাপ সমর্থিত) (৩) আওয়ামী লীগ সমর্থিত ই. পি. এস. এল এবং (৪) মোজাফফার ন্যাপ সমর্থিত ই. পি. এস. ইউ মতিয়া গ্রুপ। পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মেনন গ্রুপের ছাত্ররা বিক্ষোভ পরিদর্শন করলেও অপর ছাত্র সংগঠনগুলো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল। ভাসানী ন্যাপের সমর্থিত ঢাকা বেবী ট্যাক্সি ইউনিয়ন (সভাপতি আব্দুস সেলিম) ঐ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা শহরে হরতালের ডাক দেয়। ঐ দিন বিকালে ঐতিহাসিক পল্টন সয়দানের জনসভার প্রধান অতিথি মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী সভাশেষে মিছিল সহকারে গভর্ণর হাউজ (বঙ্গ ভবন) ঘেরাও করেন। এই ঘেরাও-এর সময় পুলিশ লাটি চার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। ফলে ভাসানী ন্যাপ, পরের দিন (৭ই ডিসেম্বর) ঢাকা শহরে এবং ৮ই ডিসেম্বর সমগ্র পাকিস্তানে হরতাল পালনের ডাক দেন। ঐ দুই দিন হরতাল পালনকালে পুলিশের লাঠি চার্জ ও গুলীবর্ষণে বেশ কয়েকজন হতাহত হন। জাতীয় প্রগতিশীল নেতা মৌলানা ভাসানী হতাহতের খবরে 'ঘেরাও আন্দোলনের' হুঙ্কার দিয়ে মাঠে নামে। দেশের অন্যান্য মূমুর্ষ রাজনৈতিক বিরোধী দল বাদ দিয়ে তিনি

www.pathagar.com

এককভাবে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ২৯শে ডিসেম্বর মৌলানা ভাসানী পাবনা জনসভায় আয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে সাধারণ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেনএবং সভাশেষে পাবনার ডি, সি-র বাড়ি ঘেরাও করে 'ঘেরাও আন্দোলনের' সূচনা করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুব-মোনায়েম সরকার সমর্থিত জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন. এস. এফ.) খুবই শক্তিশালী ছিল। এছাড়া ভাসানী ন্যাপ সমর্থিত ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ ছাড়া সরকার বিরোধী অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের তেমন ছাত্র সমর্থন ছিল না। তাই মেনন গ্রুপ তথা পিকিংপন্থী ছাত্রনেতারা সরকার বিরোধী একটি শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার মানসে একটি ছাত্র জোট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ছয়দফা সমর্থিত ছাত্র লীগ ও মতিয়া গ্রুপ যৌথভাবে গঠিত হয়—সংগ্রাম পরিষদ।

১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'ডাকসু' কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বৈরাচার আয়ুব সরকার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে এগার দফার একটি কর্মসূচি তুলে ধরে। এসময় এন. এস. এফ.- ছাত্র সংগঠনে সরকারের অনুসৃত নীতির বিরোধী দোলন গ্রুপ (সুবুর খান সমর্থিত) মোনায়েম খান সমর্থিত জমির গ্রুপকে বাদ দিয়ে ১১ দাফাকে সমর্থন করে। তাই ছাত্র ফ্রন্টের নাম পরিবর্তন করে হয়—সর্বদলীয় চাত্র সংগ্রাম পরিষদ'।

৬ই ডিসেম্বর পল্টন জনসভায় মৌলনা ভাসানী ছাত্রদের ১১ দফা সমর্থন করে আন্দোলনের ডাক দেন। কিন্তু দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ৭ই ও ৮ই জানুয়ারি ঢাকায় দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈঠকে গঠন করে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ড্যাক) ডাক-আট দফার অপর একটি নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ছাত্রদের ১১ দফার পরিবর্তে ঐ ৮ দফাকে সমর্থন করতে উপদেশ দেন। এই ৮ দফা ডাক গঠনকারী স্বাক্ষরদাতারা হলেন, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি মমতাজ মোহাম্মদ খাঁন দৌলতানা, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন. ডি. এফ.) সভাপতি-নূরুল আমীন, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ভারপ্রাপ্ত আমীর—তোফায়েল মোহাম্মদ আওয়ামী লীগ সভাপতি—নবাবজাদা নসরুল্লাহ খাঁন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফাপন্থী) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মস্কোপন্থী ন্যাপ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি -আমীর হোসেন শাহ, পাকিস্তান নেজাম-ই- ইসলাম পার্টির সভাপতি-চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, পাকিস্তান জমিয়েত উল উলামা-ই-ইসলাম সম্পাদক-মুফতি মাহমুদ।

১৭ ই জানুয়ারি 'ড্যাক' দেশব্যপী 'দাবি দিবস' পালনের আহ্বান করেন এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য উপদেশ দেয়। দাবি দিবসের বিকালে ঢাকা

www.pathagar.com

জেলা বার লাইব্রেরিতে ৫২-এর ছাত্র হত্যাকারী নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে 'ড্যাক' এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিন ছাত্ররা ১১ দফা আদায়ের লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁরা পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ১৮ই জানুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটের দিন ছাত্র মিছিলে পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস ছুটে ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে, সরকার ঢাকা শহরে সশস্ত্র ই. পি. আর. (বর্তমানে বি ডি আর) বাহিনী নামায়ে ছাত্র জনতার সাথে অঘোষিত যুদ্ধে নেমে পড়ে। ড্যাক-এর সুবিধাবাদী নেতাদের সমস্ত আহ্বান উপদেশ ও ডাকাডাকি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯শে জানুয়ারি ফের ছাত্র জনতার সাথে পুলিশ ও ইপি আর বাহিনীর সাথে শহরের বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ বাধে। ২০শে জানুয়ারি ছাত্র নেতরা ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র সভা শেষে শহরে একটি মিছিল বের করেন। এই মিছিলের মধ্যভাগে বিনা উস্তানীতে পুলিশ অফিসার বাহাউদ্দিন পিস্তল দিয়ে গুলী করে, মেনন গ্রুপের সংগ্রামী ছাত্রনেতা আসাদুজ্জ্বানকে হত্যা করে (১টা ৫৫ মিঃ)। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সমস্ত ঢাকা শহর কালো পতাকার শহরে পরিনত হয়। পরদিন ২১ শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে কমরেড আসাদর গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজের পূর্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তিনদিন (২২শে, ২৩শে ও ২৪শে) 'শোক কাল' ঘোষণা করে। নামাজ শেষে নগ্ন পায়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গমন এবং এই জামায়েত থেকে ঢাকা শহরে সাধারণ হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়। এ দিনেও পুলিশবাহিনী ছাত্র জনতার উপর গুলী চালায়ে ২৯ জনকে আহত এবং ৫৯ জনকে গ্রেফতার করে।

ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ভাসানী ন্যাপের পশ্চিম পাকিস্তান শাখা, পিপলস পার্টি ও ছাত্রদের যৌথ নেতৃত্বে ২২শে জানুয়ারি -করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার হায়দারাবাদ, সুলতান, শিয়াল কোট, লায়লপুর প্রভৃতি শহরে গায়েবানা জানাজা, ধর্মঘট, সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষিত হরতালকে কেবলমাত্র ভাসানী ন্যাপ সমর্থন করে। প্রকাশ থাকে যে, এসময় ভাসানী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমরেড তোয়াহা। একই সাথে তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) এর নেতা। এ ছাড়া ছাত্রনেতা আসাদ ছিলেন এই আত্মগোপনকারী পার্টির প্রার্থী সদস্য। যাই হোক প্রগতিশীল নেতা কর্মীদের কর্মতৎপরতায় ২৪শে জানুয়ারি হরতালের দিনে ঢাকার রাজপথে ছাত্র শ্রমিক জনতার ঢল নামে। পুলিশ ও ই. পি. আর বাহিনী নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লয়। ঢাকা শহরে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। অন্যাপায় হয়ে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে এবং রাত ৮টা থেকে পর দিন রাত ৮টা পর্যন্ত ঢাকা শহরে কার্ফিউ জারি করে দেখামাত্রই গুলী করার নির্দেশ দেয়। জনতা রাতে কার্ফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে।

www.pathagar.com

এতে অনেক হতাহত হয়। ২৬শে জানুয়ারি শোককালের কর্মসূচি পালন কালে ঢাকা, ডেমরা ও নারায়নগঞ্জে ফের বেশ কয়েকজন নিহত ও আহত হয়। ২৭ শে জানুয়ারি করাচি ও লাহোরে আন্দোলন দমন করতে সরকার সেনাবহিনী তলব করে। ২৮শে জানুয়ারি পেশোয়ারে ও বরিশারে, ২৯ শে জানুয়ারি গুজরানওয়ালা শহরে সেনাবহিনী তলব করে এবং সান্ধ্য আইন (কার্ফু) জারী করে। কিন্তু তবুও পাকিস্তনের উভয় অংশে গণবিদ্রোহ চলতেই থাকে। ফলে ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁন বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে ১৭ ই ফেব্রুয়ার এক গোলটেবিল বৈঠকের কথা ঘোষণা করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে সেনাবহিনী ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হলে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরে ফের ছাত্র-জনতার দাবির মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১২ ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের চলমান অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হলে, ন্যাপ নেতা মৌলনা ভাসানীর নির্দেশে দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মশিউর রহমান (যাদু মিয়া), লাহোরের আরিফ ইফতেকার ও রাজশাহীর মুজিবর রহমান চৌধুরী এম. এন. এ. পদে ইস্তফা দেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে চাকার কুর্মিটোলা সেনা নিবাসে গুলী করে হত্যা করা হলে ঢাকাবাসীরা রাজপথে নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই দিন জনতা পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রীদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সরকার শহরে সেনাবাহিনী তলব করে এবং সান্ধ্য আইন জারি করে। আন্দোলন জেলা শহর গুলোও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রিডার প্রষ্টর ড. সামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ২২ শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী গোল টেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন এবং তিনি শেখ মুজিবকে ও ঐ বৈঠকে যোগদান থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট গেষ্ট হাউজে গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেষ মুজিবর রহমান 'পেরলে' জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ছোটেন ঐ গোলটেবিল বৈঠকে। মাত্র ৪০ মিনিট বৈঠকের পর ১০ই মার্চ পর্যন্ত বৈঠক মূলতুবী ঘোষণা করা হয়। কেননা আন্দোলনের মূলনেতা মৌলনা ভাসানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা জুলফিক্কার আলী ভুট্টো দু'জনের কেহই এই বৈঠকে যোগদান করেন নাই। এই দুই নেতার নেতৃত্বে পাকিস্তানের উভয় অংশে সরকার বিরোধী সভা ও মিছিল চলতে থাকে।

www.pathagar.com

১০ই মার্চ আয়ুবের গোলটেবিল বৈঠক পুনরায় শুরু হলে, প্রেসিডেন্ট দুটি দাবি করেন (১) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জন প্রতিনিধিদের নির্বাচন এবং (২) ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন।

এই দিন মৌলানা ভাসানী ও জনাব ভুট্টোর এক বৈঠক হয় এবং উভয় নেতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বীকৃত দাবির ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এক মত হন। ১৩ ই মার্চ গোল টেবিল বৈঠক শেষ হলে ১৪ ই মার্চ শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন। তিনি ঢাকা বিমান বন্দরে নেমে ঘোষণা করেন যে, মৌলানা ভাসানীকে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া উচিৎ। এখানে প্রকাশ থাকে যে, মৌলনা ভাসনীর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন করে সরকারকে দিশেহারা করে দেন। এই আন্দোলনের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হয় এবং শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করে জাতির একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন। যদিও এই মামলার আসামী লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন - যিনি সত্যই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার জন্য ষড়যন্ত্রে নেতৃত্বে দেন, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষাকে শেখ সাহেব কুক্ষিগত করে নিজে 'হিরো' হিসেবে জনতার সামনে হাজির হন। যখন মৌলানা ভাসানী আন্দোলন চালু রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন, তখন শেখ মুজিব আন্দোলন বন্ধ করে নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের 'রাজা' হওয়ার জন্য মৌলনা ভাসনীর বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করতে শুরু করেন।

১৫ই মার্চ জেনারেল মূসাকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর পদ থেকে বিদায় দিয়ে ইউসুফ হারুনকে নিয়োগ করেন। ১৬ ই মার্চ পাঞ্জাবের শাহীওয়াল রেল স্টেশনে মৌলনা ভাসানীর উপর নির্বাচনপন্থীরা আক্রমণ করে। এসময় মৌলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর দলীয় রাজনৈতিক সফরে ছিলেন। ২১ শে মার্চ মোনায়েম খাঁনের বিদায় এবং তাঁর স্থালে প্রফেসর নূরুল হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদে নিয়োগ করেন। ২৪ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁন এক পত্রে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। জেঃ ইয়াহিয়া খাঁন রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে নিয়ে ২৫ শে মার্চ সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে সমস্ত দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ফলে বিলুপ্ত ঘটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ এবং অপসারিত হন গভর্ণর ও মন্ত্রীরা। মার্শাল-ল জোন-এ (পশ্চিম পাকিস্তান)-এর শাসনকর্তা হন লে. জে. আতিকুর রহমান এবং মার্শাল-ল জোন-বি (পূর্ব পাকিস্তান)-এর শাসন কর্তা হন লে. জে. মোজাফফর উদ্দিন। ২৬শে মার্চ জেঃ ইয়াহিয়া খাঁন জাতির উদ্দেশে ভাষণে ঘোষণা করেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যাক্ষ ভোটে নির্চাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধান রচনা করবেন জুলাই মাসে পাবনার জয়নগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, আব্দুল মতিন, নূরুল হক মেহেদী, মাহবুব উল্লাহ (ছাত্র

www.pathagar.com

নেতা) প্রমুখ নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম, এল)। এই পার্টির আশুলক্ষ্য নির্ধারিত হয়, 'পিন্ডি ও ওয়াশিংটনের আওতামুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র কায়েম।

কিছু দিনের মধ্যেই কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খাঁন মেনন, হায়দার আকবর খাঁন রনো প্রমুখ ছাত্র নেতার গঠন করেন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, নামে অপর একটি কেন্দ্র। অর্থাৎ প্রকাশ্যে চীনপন্থী বা পিকিংপন্থী ভাসানী ন্যাপ থাকলেও এই সংগঠনের মূলশক্তি কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরা গোপনে তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে

১৯৭০ সালের ২৮ শে মার্চ সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন জাতির উদ্দেশে ভাষণে অকেআবর মাসে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি লয়, কিন্তু ভাসানী ন্যাপের ছত্রছায়ায় কর্মরত কমিউনিস্টরা শ্লোগান তোলেন– 'ভোটের বাক্সে লাথি মার, পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর'।

আগস্ট মাসে বন্যার কারনে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ৫ই অক্টোবরের স্থলে ৭ই ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ২২শে অক্টোবরের পরিবর্তে ১৭ই ডম্বেবর পুনঃনির্ধারণ করা ঞয়। কিন্তু ১২ই নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে হাতিয়া, সন্দীপ, ভোলা প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ২০ লক্ষ অধিবাসীর মৃত্যু ঘটে। আওয়ামী লীগ বাদে বাকি প্রায় সব কয়টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন পিছানোর দাবি তোলে। ঘূর্ণিঝড়ের পর পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজনৈতক নেতা বা দেশ শাসকরা কেহই ঐ উপদ্রুত অঞ্চল সফরে আসেন নাই। তাই উপদ্রুত অঞ্চল সফর শেষে মওলানা আব্দুল হামিদখাঁন ভাসানী ২৩ শে নভেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন এবং দাবি করেন "স্বাধীন সার্বভৌম পূর্বপাকিস্তান"।

কিন্তু ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চল সফর শেষে শেখ মুজিবর রহমান ২৬শে নভেম্বর ঢাকার প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানিয়েছি,স্বাধীনতার নয়।"

সত্তরের নির্বাচনে ভাসনী ন্যাপ- যার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি ও সংগঠন ছিল, সেই দল নির্বাচন বর্জন করার পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির সামনে তেমন প্রভাবশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না ফলে নির্বাচনের ফলাফল দাঁড়াল অকল্পনীয়।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনী ফলাফল-আওয়ামী লীগ– ১৬৭টি আসন, পিপলস পার্টি-৮৮টি আসন এবং অন্যান্য দল পায় -৪৫ টি আসন (মোট আসন-৩০০ টি)। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনী ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানে ২৮৮ টি আসন রাব করে এবং বাকি ১২ টি

www.pathagar.com

আসন পায় অন্যান্য দল (মোট ৩০০ আসন) পাঞ্জাবে পিপলস পাটি পায় ১১৩ টি আসন এবং অন্যান্য দল পায় ৬৭ টি আসন (১৮০ টি আসন) সিন্ধুতে পিপলস পার্টি পায়-৩৪টি আসন এবং বাকি ২৬টি পায় অন্যান্য দল(মোট ৬০ টি আসন), উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পি. পি. পি. পায় ৪টি আসন এবং বাকি ৩৬ টি পায় অন্যান্য দল (মোট ৪০ টি আসন)। অর্থাৎ নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে মিঃ ভুট্টোর পি. পি. পি ১৫১ টি আসন লাভ করে এবং বাকি ১৩৭ টি আসন পায় (আওয়ামী লীগ ছাড়া) অন্যান্য দল। পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টি যেমন কোনো আসন লাভ করেনি, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগও কোন আসন লাভ করতে পারেনি। ফলে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানি পার্টি এবং পি. পি. পি. পশ্চিম পাকিস্তানি পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে জাতীয় পরিষদ পরিচালক তথা রাষ্ট্রপ্রধান মানতে স্বীকার কররেও চয়দফা ভিত্তিক শাসন তন্ত্র রচনা করতে অস্বীকার করেন।

আওয়ামী লীগ ৩রা জানুয়ারি 'বিজয় দিবস' ঘোষণা করে ঢাকার রেষকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোরওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান তাঁর দলীয় নির্বাচিত সদস্যদের ছয়দফা তথা স্বায়ত্ব শাসন বাস্তবায়নের জন্য প্রকাশ্যে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১১ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খাঁন ঢাকায় আসেন এবং ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারি শেখ-ইয়াহিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগের আগে 'শেখ সাহেব পরবর্তী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী' বলে মন্তব্য করেন। অতঃপর ১৭ই জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানায় শেখ-ইয়াহিয়ার দ্বিতী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি মৌলনা ভাসানী 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের দাবি তোলেন। প্রসঙ্গগত বলা প্রয়োজন যে, মৌলনা ভাসানী ইতোপুর্বে ১৯৫৬ সালেও পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার দাবি করে ছিলেন এবং সেদিন আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোরওয়াদী ও তাঁর ভাবশিষ্য শেখ মুজিব এই মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে বলে ছিলেন–টুপি সর্বস্ব মৌলনা, তিনি রাজনীতির কিছুই বোঝেন না। ফলে সেদিন মৌলনা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এবারও শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার পুয়রা বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং ভাসানীও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে থাকেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তথা গদি পাওয়ার জন্য শেখ সাহেব যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা তাঁর কাছে শত্রুদের মতবাদ বলেই মনে হয়ে ছিল।

১৫ ই ও ১৬ ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগের ওয়াকিং

www.pathagar.com

কমিটির সভায় শেখ মুজিবর রহমানকে জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে 'ডেপুটি লীডার' নির্বাচিত করা হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে শেখ-ইয়াহিয়া পুনরায় বৈঠকে বসেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি জনাব ভুট্টোর সভাপতিত্বে পি. পি. পির জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের দুই দিন ব্যাপী পার্লামেন্টারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান রচনার বিরুদ্ধে নির্বাচিত সদস্যরা পদত্যাগের হুমকি দেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি লাহোর জনসভায় জনাব ভুট্টো, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত, অন্যথায় ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার সময় সীমা প্রত্যাহারের দাবি করেন। শেখ সাহেব–ভাসানী, ভুট্টোর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকেন এবং কর্মীদের লেলিয়ে দেন।

১লা মার্চ দুপুরে বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন, ৩রা মার্চ ঢাকায় আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করেন এবং অপর এক আদেশ বলে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ফলে বেসামরিক গভর্ণরগণ অপসারিত হন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের দায়িত্ব দেওয়া হয় লে. জে. সাহেবজাদা মো. ইয়াকুব খাঁনের হাতে।

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের পর পরই ঢাকার রাজপথে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিলে ছেয়ে যায়। রাজপথে জনতা ভাসানীর মতের সাথে একত্বতা ঘোষণা করে দাবি তোলে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার। কিন্তু শেখ সাহেব তখনও পাকিস্তানের ভাবী প্রধান মন্ত্রীর দিবাস্বপ্ন দেখছেন। তাই শেখ সাহেব জনতার উদ্দেশে ঘোষণা করেন— ২রা মার্চ ঢাকা শহরে এবং ৩রা মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল।

২রা মার্চ হরতালের মিছিলে গুলী চালায়ে হতাহত করা হয়। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় ডাকসুর ভি. পি. আ.স.ম. আব্দুর রব সর্ব প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। সবুজ জমিনের মাঝে লাল সূর্য এবং সূর্যের মধ্যে হলুদ রঙের পূর্ব পাকিস্তানের তথা পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা (স্বাধীন পূর্ব বাংলার) পতাকা উড়ায়ে ছাত্ররপাও ভাসানীর মতের সাথে একত্বতা ঘোষণা করলেন। কিন্তু শেখ সাহেব তখনও এক বিবৃতিতে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি করে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার বৃথা চেষ্টা করছেন।

এই দিন সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা পৌরসভা এলাকায় সন্ধ্যা ৭ থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন (কার্ফু) জারি করেন। কিন্তু জনতা এই দুই দিনেও সান্ধ্য আইন অমান্য করে মিছিল বের করে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে। আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে কর্তৃপক্ষ ৪ঠা মার্চ থেকে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করেন। এই দিন বিকালে ছাত্র লীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দীকির সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানের ছাত্রজনসভায় শেখ মুজিবর রহমান অসহযোগ

www.pathagar.com

আন্দোলনের ডাকদেন। প্রকাশ থাকে যে, এই সভামঞ্চে ছাত্ররা স্বাধীন বাংলার পতাকা, উত্তলন করে ছিলেন। ৬ই মার্চ জেনারেল টিক্কা খাঁনকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

৭ই মার্চ শেখ মুজিব দেশের মুক্তিকামী ছাত্র–জনতাকে বিপথগামী করে নিজের গদি লাভের জন্য রেসকোর্সের (সোরওয়ার্দী উদ্যোনের) জনসভায় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ঘোষণার পরিবর্তে ঘোষণা করেন চার দফা শর্ত :- (১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে; (২) সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লইতে হইবে; (৩) গণহত্যার তদন্ত করেতে হইবে; (৪) জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। অন্যথায় তিনি জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করবেন না।

৯ই মার্চ ঢাকার জনসভায় মৌলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, "পূর্ব পাকিস্তান অবশ্যই স্বাধীন হবে। আমরা আর পকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে পারি না।..... আমি অসহযোগ অহিংসায় বিশ্বাস করি না। .... তোমরা পশ্চিমাদের হিংসা কর, হিংসা কর, হিংসা কর।" মৌলানা ভাসানীর পুরা ভক্তৃতাটাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন শোষণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পক্ষে জনতাকে জাগাবার উত্তেজনা ও তথ্য মূলক কথা।

১৩ই মার্চ পূর্বাঞ্চলের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ জারি করেন যে, ১৫ই মার্চ থেকে সকল সরকারি কর্মচারী কাজে যোগদান করবে, না করলে তাদের চাকরি থেকে শুধু বাদ দেওয়া হবেনা, উপরন্ত সামরিক আদালতে বিচার করে সর্বোচ্ছে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

১৪ই মার্চ শেখ মুজিববর রহমান বিকল্প সরকারের ৩৫ টি নির্দেশবিধি জারি করে শাসক গোষ্ঠিকে শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের জন্য চাপ অব্যহত রাখেন।

১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খাঁন ঢাকাতে এসে ১৬ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত বেশ কয়েক দফা ইয়াহিয়া-মুজিব এবং মুজিব-ভুট্টো বৈঠকে মিলিত হন। এসব বৈঠকে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় শেখ সাহেব ২৫শে থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত দেশ ব্যাপী আবার হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

২৩শে মার্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। এই দিন বিকালে পল্টন ময়দানে ভাসানী ন্যাপের জনসভায় দলীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) ঘোষণা করেন যে, আমাদের এক দফা– তা হলো স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান। এখানে প্রকাশ থাকে যে, মতাদর্শের কারণে কমরেড তোয়াহা ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরে যান এবং আত্মাগোপনকারী–পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম,এল)–কে সংগঠিত করে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

২৫শে মার্চ বিকালে শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ পল্টন ময়দানের শ্রমিক সভায় ঘোষণা করেন যে, শক্তিমালী পাক-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। তিনি কমরেড মাও-এর 'গ্রামে ঘাঁটি' এবং 'গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শ্রশিক-জনতার সামনে তুলে ধরেন।

রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন রাজধানীর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

রাত এগারটার পর পাক-সেনারা ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়ে এবং বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পুলিশ হেড কোয়াটার ও ই. পি. আর. হেড কোয়াটার পুনদখলে আনে। এই যুদ্ধে অনেক পুলিশ ও ই. পি. আর জোয়ান মারা যান এবং বাকিরা পালায়ে জনগণের মধ্যে মিশে যান। এর পর পাকবাহিনীর ব্যাপক অভিযান শুরু হয়। ঢাকার রাজপথে গাড়িতে করে টহল দিতে থাকে এবং এলোপাতাড়ি গুলী ছুড়ে ফুটপাতের লোকদের হত্যা করে। বস্তিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। হিন্দু মহল্লা–শাঁখারী বাজার ও তাঁতী বাজারে আক্রমণ করে অনেক জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করে। সংবাদ, ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলোর উপর আঘাত হেনে ধ্বংস করে। ছাত্র বাহিনীর ঘাঁটি ইকবাল হল, জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলে আক্রমণ করে অনেক ছাত্র–কর্মচারী হত্যা করে। এভাবে ২৬ শে মার্চ পাক–বাহিনী প্রদেশিক রাজধানী নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ

২৬শে মার্চ পাবনায় জনতা–পুলিশ পাক-বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। ২৭শে মার্চ পাবনাকে মুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়। এদিকে মেজর (জেনারেরল) জিয়া (প্রেসিডেন্ট) [সহকারী মেজর (জেনারেল) মীর মওকত আলী] বিদ্রোহ করে চট্টগ্রামের কালুঘাট ট্রান্সমিশন (রেডিও) থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিশ্ববাসীর কাছে সাহার্য্য চান। এই দিন মেজর (ব্রিগেডিয়ার) খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে কুমিল্লা–সিলেট অঞ্চলের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাক-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মেজর (জেনারেল) শফিউল্লার * নেতৃত্বে জয়দেবপুর সেনানিবাস থেকে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে ঢাকা সেনানিবাস আক্রমণ করে। কুষ্টিয়াতে মেজর আবু ওসমান; বগুড়া ও রাজশাহীতে মেজর নজমুল হক ও তার হকারী ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার) গিয়াসের নেতৃত্বে ই. পি. আর ও পুলিশবাহিনী পাক-বাহিনীকে প্রতিরোধ করে।

এপ্রিলের শেষ দিকে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে এই মুক্তি যুদ্ধে যোদ দিলেন- মেজর (জেনারেল) মনজুর, মেজর (লে. কর্ণেল) জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন (মেজর) ডালিম

---

* বাঙালি কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খানকে ২৩শে মার্চ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে মিটিং–এর নাম করে ঢাকা ক্যান্টমেন্টে সরিয়া আনে এবং ২৫শে মার্চ থেকে তাঁকে বন্দী করে রাখে। ফলে তাঁর সহকারী মেজর শফি বিদ্রোহের নেতৃত্বে দেন।

www.pathagar.com

প্রমুখ দেশপ্রেমিক বাঙালি অফিসার ও সেনাগণ। বাঙালি সেনাদের বিদ্রোহগুলো ছিল সমস্তই ব্যক্তিগত দেশপ্রেম বোধ থেকে উদ্ভূত। সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও এক বাহিনী অন্য বহিনীর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলেই প্রথম দিকের কোনো আক্রমনেই তাঁরা জয়ী হতে পারেন নি।

এই মুক্তি যুদ্ধের প্রথমদিকেই পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ দেবেন ও বাশারের নেতৃত্বে ভারতে পলায়ন করে। কিন্তু মূল অংশ মতিন আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। এই পার্টি কমরেড টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাবনা এবং কমরেড ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে রাজশাহীর আত্রাই এলাকায় প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্ত ঘাঁটি এরাকা পড়ে তোলে।

পুর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম, এল) প্রথমদিকে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করলেও, যুদ্ধের মাঝামাঝিতে পার্টিতে দুই লাইনের সংগ্রাম দেখা দেয়। ফলে নোয়াখালীতে কমরেড তোয়াহা ঢাকাতে কম. খন্দকার আলী আব্বাস, ময়মনসিংহে কম. ইয়াকুব আলী, ফরিদপুরে কম. শান্তি সেন, সিলেটে কম. আসদ্দর আলীসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পার্টির অধিকাংশ সভ্য ও ক্যাডারগণ পাক ফ্যাসিস্ট দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোদ যুদ্ধ চালিয়ে যান। অপরাংশ কমরেড আবদুল হক ও কম. অজয় ভট্টচার্য্য-এর নেতৃত্বে যশোর-কুষ্ঠিয়াতে একই সাথে পাক-বাহিনী ও ভারতের মদদপুষ্ট মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। পরিশেষে শুধু সুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ পরিচালনা করে।

রাজধানীতে পাক-বাহিনীর মার খেয়ে আওয়ামী লীগ কর্মী ও ছাত্রনেতারা গ্রামে আশ্রয় নেয় এবং পুলিশ; ই. পি. আর. বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও প্রাক্তন সৈন্যদের সমন্বয়ে বাঙালি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করলেও শেখ মুজিব, ইয়াহিয়ার কাছে আত্ম-সমর্পন করে জেলে যান।

এদিকে বাঙালি বাহিনী, বিশেষ করে ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মীরা ঢাকায় মার খেয়ে দেশের অন্যান্য স্থানে এই মারের পাল্টা হিসেবে-উর্দুভাষী জনগণকে ফ্যাসিস্ট কায়দায় ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকে এবং জনগণকেও একাজে উৎসাহিত করে। কালুরঘাট, কাপ্তাই, চন্দ্রঘোণা, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি স্থানে কর্মরত অবাঙালি শ্রমিকদের ধরে হত্যা করতে থাকে। এছাড়া খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ, শান্তাহার, পাকসী, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি মফস্বল শহরগুলোতে অবাঙালি হত্যা, তাদের দোকান ও ঘর-বাড়ি লুট-তরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারীদের ধর্ষণ করতে থাকে। পাক-সেনারা ঢাকার রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার পর দেশের অন্যান্য শহরও তারা দখলে আনে। ফলে প্রতিরোধকারী বাহিনীর অধিকাংশই ভারতে পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ

মুসলিম বুর্জোয়া তথা মুসলিন আমলাতান্ত্রিক পুঁজি ও সামন্তদের স্বার্থ রক্ষাকারী দল। এই পুঁজির অধিকাংশই মালিক ছিল অবাঙালি মুসলমানেরা। বাঙালিদের স্বাধীকারের সংগ্রামের সূচনাতেই এই দল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তাকে সমর্থন দেয় এবং তাদের সাথে এক জোটে কাজ করতে থাকে।

আওয়ামী লীগ :- উঠতি বাঙালি পুঁজিপতি, বাঙালিআমলা ও বাঙালি সামন্তদের স্বার্থরক্ষাকারী দল। পাকবাহিনীর হাতে মার খেয়ে দলীয় নেতৃবর্গ ভারতে পলায়ন করে। পাক-সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক বাঙালি সামরিকবাহিনীর সদস্য ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলার অধিবাসীগণ যখন পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে, তখন এই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারত সরকারের সাহায্যে, তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে ১৫ই এপ্রিল ভারতের আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করেন। [কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার সীমান্তবর্তি বৈদ্যনাথ তলা গ্রামকে মুজিবনগর ঘোষণা করে, এখানের আমবাগানে বিদেশী সাংবাদিকদের ডেকে এনে ১৭ই এপ্রিল এই সরকারের মহরুৎ উৎসবটি উদযাপন করে, সবাই ফের কলকাতায় পাড়ি জমান।] অস্থায়ী সরকার প্রথমে কর্ণেল (জেনারেল) এ. জি. এম. ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি ও কর্ণেল (অবঃ) রবকে সহকারী প্রধান নিযুক্ত করে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পূর্ব বাংলাকে ৪টি সেক্টরে ভাগ করে দেয়। এই সেক্টর চারটি (১) চট্টগ্রাম (মে. জিয়া), (২) কুমিল্লা (মে. খালেদ মোশারফ) (৩) সিলেট (মে. কে. এম শফিউল্লাহ) কুষ্টিয়া (মে. ওসমান) [পরে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়]। একই সাথে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র স্থাপনের কথাও ঘোষণা করা হয় (ইহাও কলকাতার শহরতলীতে স্থাপিত হয়েছিল)। প্রকাশ থাকে যে, ভারত সরকারের সর্বত্ব সাহায্য লাভের জন্য তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, ভারত কতৃত্ব উত্থাপিত সাতটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন [পরবর্তীকালে ইন্দিরা-মুজিব যুক্ত স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই চুক্তির নাম হয় "বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি।] চুক্তির ধারাগুলো নিম্নরূপ:-

১। ভারতীয় সামরিক অফিসারদের ব্যবস্থাপনায় আধা-সামরিকবাহিনী গঠিত হইবে। অস্ত্রশস্ত্র ও সংখ্যায় এই বাহিনী বাংলাদেশের মূল সামরিকবাহিনী হইতে বড় ও তাৎপর্য পূর্ণ হইবে।

২। ভারত হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে এবং ভারতীয় সামরিক অফিসারদের পরামর্শেই তাহা করিতে হইবে।

www.pathagar.com

৩। ভারতীয় পরামর্শে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কর্মসূচি নির্ধারণ করিতে হইবে।
৪। বাংলাদেশের একশালা ও পাঁচশালা পরিকল্পনা ভারতীয় পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।
৫। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুরূপ হইতে হইবে।
৬। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলো ভারতীয় সম্মতি ছাড়া বাতিল করা যাইবে না।
৭। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোন সময় যে কোন সংখ্যায় বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং বাধাদানকারী শক্তিকে ধ্বংস করিয়া অগ্রসর হইবে।"

এরপর ভারত সরকারের সাহয্যে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তি ভারতীয় গ্রামে বা বাজারে ইয়থ–ক্যাম্প খুলে দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী যুবকদের অফিসারদের দ্বারা ট্রেনিং দিয়ে ফ্রিডোম ফ্টিহার' (এফ. এফ) বা মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এই মুক্তিবাহিনীতে দেশ প্রেমিক যুবকদের সাথে সাথে প্রগতিশীল তথা কমিউনিস্ট কমীরাও গোপনভাবে যোগ দিয়ে যুদ্ধে নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাবিত অঞ্চল গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় মেজর জেনারেল ওবানের পরিচানায় দেরাদুনে ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রলীগ কর্মী, বিশেষ করে তোফায়েল গ্রুপের ছেলেদের নিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি. এল. এফ.) নামে অপর একটি বাহিনী বা মুজিববাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর কাজ ছিল মুক্তি বাহিনীতে কর্মরত কমিউনিস্ট বা প্রগতিলীল কর্মীদের হত্যা করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বজায় রাখা। [মুজিব বাহিনীর চার প্রধান (১) সিরাজুল আলম খান (২) আ. রাজ্জাক, (৩) শেখ ফজলুল হক মণি (৪) তোফায়েল আহমদ।]

জামায়েত ইসলামী. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের টাকা ও পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সুন্নী-কাদেয়ানী দাঙ্গার নায়ক, মওলানা আবুল আলা মুওদুদী, পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী বা ইসলামী সংঘ নামক এই ধর্ম ভিত্তিক রানৈতিক দলটি গঠন করেন। সাম্রাজ্যবাদীরা দেখেছে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি স্থান আরব ভূখণ্ডে, অন্ধধর্ম বিশ্বাস ও অশিক্ষার ফলে জন জনসাধারণকেসহজেই শোষণ শাসন করা সম্ভব। কারণ এরা রাজা বা সরকার প্রধাণকে আল্লাহর আর্শীবাদ প্রাপ্ত বলে মনে করে। ফলে হাজার হাজার নিড়ীড়নেও রাজদ্রোহী হয় না। সাম্রাজ্যবাদ এসব দেশের শাসকদের মাধ্যমে পররাষ্ট্র দখলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বাঁধিয়া মুসলমানদের হত্যা করতে সক্ষম হচেছ এবং সাথে সাথে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে অঢেল ধনসম্পদ শোষণ করতে পারছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানেরা অন্ধ-ধর্মভীরু হলেও রাজনৈতিক সচেতন এবং নিজেরা অভাব ও অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য শোষণকারী সরকার বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ইসলামী আদর্শ [(১)

www.pathagar.com

জন্ম (২) মৃত্যু, (৩) খাদ্য, (৪) ধন-সম্পদ এই চারটি বিষয় আল্লাহর হাতে বিশ্বাস করা অর্থাৎ ধনী-গরিব আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ মহাশক্তি শালী, তাঁকে ভয় কর, তাঁর ইচ্ছাতেই জন্ম ও মৃত্যু হয় এবং মানুষ রাজা বাদশা, গরিব থেকে ধনী হওয়া বা রাজাকে উচ্ছেদ করা মানেই আল্লাহর বিরুদ্ধে যাওয়া। সুতরাং বিদ্রোহ করার দরকার নেই, শুধু আল্লাহকে খুশি করতে ইবাদৎ কর] না মেনে বামপন্থী অথবা কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদীদের আদর্শ (ধনী-গরিব মানুষের সৃষ্টি। সমাজ ও রাষ্ট্র শাসকরা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শোষণমুলক আইন তৈরি করেছে এবং এই আইনী বলে জনসাধারণকে শোষণের মাধ্যমে ধনী-গরির সৃষ্টি করেছে ও করছে) বিশ্বাস করে শোষক সরকারকে উচ্ছেদের মাধ্যমে নিজেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিতে চায় ।

মুসলামান ধনীদের একক শোষণের স্বার্থে, ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করা হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। এই পাকিস্তানী মুসলমানেরা যেন সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের ভাগ্যপরিবর্তনের চেষ্টা না করে, সর্বদা আল্লাহর শক্তি ও দয়ার কথা চিন্তা করে, সেদিকে লক্ষ রেখেই পাকিস্তানি মুসলমানদের নতুন করে মুসলমানী দলভূক্ত করার জন্য, পাকিস্তান ইসলামী সংঘ বা জামায়েতে ইসলামী গঠিত হয়। মুল্যায়ণে বলা যায়– সাম্রাজ্যবাদের শোষণের স্বার্থে ধনতন্ত্র রক্ষা তথা সাম্যবাদীদের দমন ও প্রতিরোধের উদ্দেশেই এই সম্প্রদায়িক সংগঠনটির সৃষ্টি।

ভাসনী ন্যাপ: বাঙালি জাতীয় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী দল। [তখন পিকিং পন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোও গোপনে এই পার্টির ছত্রছায়ায় কাজ করিত।] স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েমের জন্য এদলের কমীগণ মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।

মওলানা ভাসানী ভারতে প্রস্থান করেই [কলিকাতায় ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (সি. পি. এম) অফিসে] দলীয় কর্মী ও দেশবাসীর উদ্দেশে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে অগ্রসর করে লওয়ার যে আহবান ও নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, তাকে অবলম্বন করে ১৯৭১ সালের জুন মাসে গঠিত হয় " বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি"। নিম্ন লিখিত ১১ টি রাজনৈতিক দল ও গণসংঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ইহা গঠিত হয়:—

১। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)
২। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি,
৩। পুর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন)
৪। শ্রমিক-কৃষক কর্মীসংঘ,
৫। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার)
৬। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র (নজরুল)

www.pathagar.com

৭। পুর্ব বাংলা কৃষক সমিতি,

৮। পুর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন,

৯। বাংলাদেশের শ্রমিক ফেডারেশন,

১০। পুর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন,

১১। পুর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, মওলানা ভাসানী ভারতে প্রস্থান করার কিছু দিনের মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে দেখা করার জন্য দিল্লী যেতে আমন্ত্রণ পাঠান এবং সেই থেকে তিনি দলীয় কর্মী ও দেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। জানা যায় ভাসানীকে নজর বন্দি করে সকল লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়। কারণ তিনি পুর্ব বাংলার স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতীয় সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে ন্যাপের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ভারত থেকে পালিয়ে পাক সরকারের নিকট আত্মাসমর্পণ করেন [তাছাড়া ন্যাপের অঙ্গ সংগঠন কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড আবদুল হক ও শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা এই দুই জনের কেই ভারতে গমন করেন নাই।] এসব খবর ন্যাপের সাধারণ কর্মীদের নিকট না পৌছানোর ফলে তারা মূলত মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে কাজ করতে থাকে। এই কমিটির কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :— "জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এই পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি জনগণের নিকট নিম্নলিখিত করণীয় কর্তব্য উপস্থিত করিতেছে :—

১। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে সর্বদলীয় গণ-মুক্তি পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সর্ববিধ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে। গ্রাম -রক্ষী বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করিবে এবং গণ-আদালত গঠন করিয়া বিচার ব্যবস্তা পরিচালনা করিবে।

২। পাক-জঙ্গী শাহী সরকারকে দেয় খাজনা, ট্যাক্স ঋণ ও সুদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইবে।

৩। যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় প্রয়োজনাতিরক্ত খাদ্য শস্য মজুত রাখিবে, গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

৪। গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামে গরীব জনসাধারণের উপর নিপীড়ণ মূলক মহাজনী ব্যবস্থা বন্ধ করিবে।

৫। (ক) যাহারা পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা, সাহায্য প্রদান করিবে অথবা চর হিসাবে কাজ করিবে, গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের

www.pathagar.com

কঠোরতম শাস্তি প্রদান করিবে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

(খ) যে সকল জোতদার জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে থাকিবে তাহাদের সহিত পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের উপর জোতদারের উপর পূর্বতন শোষণ লাঘব হয়।

৬। বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক বাস্তহারা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি তত্তাবধান করিবে।

৭। যথোপযুক্ত বিলি-বণ্টন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কেনা, বেচা, কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় আত্মনির্ভরশীল স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইবে পারস্পরিক সাহায্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual aid and mutual Cooperation)।

৮। শিক্ষা ও সাংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারা সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষা ও কলুশিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।

৯। (ক) গ্রামে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ও অন্যান্য জঙ্গী তরুণদের সমবায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল গঠন করিতে হইবে। এই গেরিলা দল সুযোগ সুবিধা মতো বিভিন্নভাবে অবস্থিত শত্রুকে খতম ও ক্ষতি সাধন করিবে এবং শত্রুর অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অস্ত্রবলবৃদ্ধি করিবে।

(খ) হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে যাহাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা, অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে না পারে এবং নির্বিবাদে শাসন ও শোষণ চালাইতে না পারে, তাহার জন্য সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ লাইন ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করিতে হইবে।

(গ) গেরিলা দলকে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে জন্য
জনগণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে,
জনগণকে সাহায্য করিতে হইবে,
জনগণকে রক্ষা করিতে হইবে।

(ঘ) গেরিলা দল সামরিক দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে জনগণের মধ্যে জাতীয় মুক্তির স্বপক্ষে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনও চালাইবেন।

(ঙ) যে সকল ব্যক্তি হানাদার পাক সরকার ও পাক বাহিনী অথবা তাদের এজেন্টদের সহিত স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা যে কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে, তাহারা জাতীয় শত্রু বলিয়া পরিগনিত হইবে। পূর্ণ তদন্ত করিয়া সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাদের খতম অথবা যে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

www.pathagar.com

১০। যাহারা জনগণের মনোবল নষ্ট করিবার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার প্রচারকার্য চালাইবে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে।

১১। যাহারা জনগণের দুরাবস্থার সুযোগে ডাকাতি, গুন্ডামী ও অন্যান্য সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত, গণ-মুক্তি পরিষদের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। যাহারা মুক্তি সংগ্রামকে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত করিবার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া-কলাপ, উস্কানী অথবা প্রচারণা করিবে তাহাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হইবে।

১৩। শহরাঞ্চলে শত্রুকে বিপর্য্যস্ত ও ব্যস্ত রাখিবার জন্য "আঘাত করো ও সরিয়া পড়ো" নীতির ভিত্তিতে গেরিলা তৎপরতা চালাইতে হইবে।

১৪। সর্বস্তরের জনগণকে জঙ্গী বাহিনীর প্রশাসনিক ও সকল প্রকার ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিতে হইবে।

১৫। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাহাদের পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অচলাবস্থা অব্যাহত রাখিবার সমন্বয় কমিটি উদাত্ত আহবান জানাইতেছে।"

সমন্বয় কমিটির এই পনের দফা কর্মসূচি শুধু মাত্র কাগজে কলমেই স্থান পায়। যেহেতু ঐ কমিটির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা (অধিকাংশই) ভারতের আশ্রয়ে ছিল, সেহেতু পূর্ব বাংলার মাটিতে উহা প্রয়োগ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ঐ সমন্বয় কমিটির অঙ্গ সংগঠনগুলো সমথিত যে-সব কর্মী দেশের মধ্যে ছিল, তারা মূলত মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি : কম. মণি সিংহের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (বর্তমান বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি) এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদের নেতৃত্বে [(ন্যাপ) রিকুজিশন নামে পরিচিত] ন্যাপ রাশিয়ার অর্থ সাহায্যে ও ভাবাদর্শে গঠিত। রুশ পার্টির নির্দেশিত রণনীতি ও রকৌশলই এই কমিউনিস্ট পার্টি যান্ত্রিকভাবে এদেশের প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। এরা রাশিয়ার নির্দেশে আওয়ামী লীগের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। এ ছাড়া এই পার্টির রণকৌশলগত লাইন ছিল আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করা। যদিও তখন মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি মোজাফফর ন্যাপের ছত্রছায়ায় কাজ করিত। তাছাড়া মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া তখন এই ন্যাপের কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল.) : পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। এরা পিকিংপন্থী বা হক-তোয়াহার পার্টি নামে পরিচিত ছিল। এ পার্টির সম্পাদক ছিলেন

www.pathagar.com

কররেড সুখেন্দু দস্তিদার। এই পার্টির নিজস্ব বাহিনী (লাল ফৌজ), পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধেই ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লাসহ মোট ষোলোটি জেলায় যুদ্ধ করে এবং কয়েকটি অঞ্চল মুক্ত করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্টির নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কর্মীদের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে এই অঞ্চল ও সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে এ বাহিনী অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায় এবং অবশিষ্টরা জনগণের মধ্যে আত্মগোপন করে। যুদ্ধের এই পর্যায়ে এই পার্টিতে হক-অজয় চক্রের উদ্ভব হয়। চীনা পার্টির বক্তব্যকে সমর্থন করে তাঁরা (চক্র) পার্টির নির্দেশ অমান্য করে পাক সেনাদের বাদ দিয়ে শুধু মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র চালিয়ে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এল-এল) : ইহাও পিকিং পন্থী, আলাউদ্দিন-মতিনের পার্টি নামে পরিচিত। ইহারাও পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির ন্যায় পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, প্রভৃতি জেলাতে যুদ্ধ করে। কম. টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাবনা, কম. ওহিদুর রহমানের নতৃত্বে আত্রাইতে জাতীয় প্রতিরোধ যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পরে রেডিও পিকিং-এর বাংলা অনুষ্ঠান থেকে প্রত্যহ "কমরেডগণ ও বন্ধুগণ, রুশ ভারতের হানাদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়াতে" শুনে বিভ্রান্ত হন এবং ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের পতন ডেকে আনে।

অন্যান্য গ্রুপ : (১) কাজী জাফর-রনো-মেনন ভারতে আশ্রয় লন এবং ভাসানী ন্যাপকে অনুসরণ করেন।

(২) দেবেন-বাসার ভারতে আশ্রয় নিয়ে সংগ্রাম সমন্বর কমিটিতে যোগ দেন।

সর্বহারা পার্টি গঠন

১৯৭১ সালের ৩রা জুন, বরিশাল জেলার স্বরূপ কাঠির পেয়ারা বাগানে কমরেড সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে "পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি" নামে একটি নতুন কমিউনিস্ট গ্রুপ গঠিত হয়। নতুন করে কমিউনিস্ট কেন্দ্র গঠন এবং উল্লেখিত বাংলাদেশের মূল কমিউনিস্ট পার্টি প্রসঙ্গে বলা হয়, "পূর্ব বাংলার জনগণকে এরা ভাওতা দিতে সক্ষম হচ্ছে, কারণ, হক-তোয়াহা-নয়া-সংশোধনবাদী; দেবেন-বাশার, মতিন-আলাউদ্দিন– ট্রটস্কি চেবাদী; কাজী–রণ মেনন, ষড়যন্ত্রকারী এবং মনি সিং -মোজাফফর– সংশোধনবাদী বিশ্বাস ঘাতক চক্র, পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্নে বামপন্থীদের ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।" প্রকাশ থাকে যে "পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন"-এর পরবর্তী নাম হলো সর্বহারা পার্টি।

www.pathagar.com

মাত্র নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্য দেখে ভারত সরকার প্রমাদ গোনেন। কারণ বাংলাদেশের মধ্যে কমিউনিস্টদের (বিশেষ করে পিকিং পন্থীর) প্রভাব বেড়ে যেতে থাকে। মুক্তি বাহিনীর ৮০% সদস্যই ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (উভয় গ্রুপ) তথা সাম্যবাদী আদর্শে গড়া।

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর প্রধান ভারতীয় সেনাপতি জে. জগজিৎ সিং আরোরার নিকট পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্ম সর্ম্পণের পর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল.)-এ স্বাধীনতা সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত প্রকাশিত হয়।

কমরেড আব্দুল হক, অজয় ভট্টচার্য, শরদিন্দু দস্তিদার প্রমুখ মত প্রকাশ করেন যে, "সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা, সাম্প্রসারণবাদী ভারতের পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল দখল করে নিয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্রাস করার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে।" সুতরাং তাঁরা করণীয় নির্ধারণ করেন "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসন হটাতে হবে; পাকিস্তান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে আমরা পাকিস্তানের সাথে থাকব, না আলাদা হবো" ইত্যাদি।

সুখেন্দু দস্তিদার, তোয়াহা, হাবীব, লালা শরদিন্দু দে প্রমুখ কমরেড, পূর্ব মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। ফলে ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি পার্টির বর্ধিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পার্টির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, "বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা. লে.)"।

কমরেড তোয়াহার ডাইরিতে লেখা আছে যে, কম; সত্যমিত্র (মোমিন), পাটিতে চারু মজুমদারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। তিনি 'হকগ্রুপ' ও 'তোয়াহা-গ্রুপ' সৃষ্টির মূলে কাজ করেছেন।

প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই মুজিব সরকার পাকসেনাদের সাহায্যকারী মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী প্রভৃতি ডানপন্থী দলগুলো বে আইনী ঘোষণা করলেও কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করেণ নাই।

মুজিব-তোয়াহা বৈঠক

দেশ স্বাধীনের পর ১০ই জানুয়ারি শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারা মুক্ত হয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসেন এবং তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে নেমেই তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে জানতে চেয়ে ছিলেন, "তোয়াহা, যাদু মিয়া কোথায়?" তাঁদের বলো অনেকের হাতে অস্ত্র আছে, আমার কোন কন্ট্রোল নাই; তাঁরা যেন সাবধানে থাকে।

www.pathagar.com

১৭ই ফেব্রুয়ারি মুজিব বাহিনীর নেতা তোফায়েল আহম্মদ (শেখের রাজনৈতিক উপদেষ্টা) ঘোষণা করেন যে, মার্কিন নেতা আব্রাহাম লিঙ্কনের 'গণতন্ত্র' এবং জার্মানের কার্ল মার্কসের 'সমাজতন্ত্র' মিলে তৈরি হবে 'মুজিববাদ' । (১) গণতন্ত্র, (২) সমাজতন্ত্র, (৩) জাতীয়তাবাদ (৪) ধর্ম নিরপেক্ষ এই চার নীতির উপরেই 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিশ্বের পাঁচটি বৃহৎ শক্তির তিনটি ইউরোপ মহাদেশে, একটি আমেরিকা মহাদেশে এবং বাকিটি এশিয়া মহাদেশে গণচীন। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভে গণচীন 'ভেটো' দেওয়ায় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব, চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তথা সাম্যবাদী দলের নেতা কমরেড তোয়াহার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন। আত্মগোপকারী কমরেড তোয়াহা শেখের সাথে দেখা না করে বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে শেখ সাহেবকে এক দীর্ঘ পত্র পাঠান। চিঠিতে দুটি গুরুত্ব পূর্ণ অংশ ছিল "(১) তোমার সমাজতন্ত্রের বাগড়ম্বর ছেড়ে দাও। গরুর গাড়ীতে একটি আধুনিক জেট প্লেনের ইঞ্জিল জুড়ে দিলেই যেমন তা আকাশে উড়বেনা, তোমার আওয়ামী লীগ দিয়েও তদ্রুপ সমাজতন্ত্র হবে না। সমাজতন্ত্র যাঁরা করবে, তাঁরা যথা সময়ে তাঁদের সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। তোমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তাঁদেরকে রক্ষা করা। (২) তোমাকে ঘিরে আজ জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠছে, এতে স্ফীত বক্ষ হয়ো না। তোমাকে ঘিরে যারা জিন্দাবাদ করেছে, এদের সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। কেননা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরা করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। কাজেই তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক থাকবে।" এই পত্রটি-মুজিব ও তোয়াহার বন্ধু (সাবেক এম. এন. এ. এবং পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক) আব্দুল মোহাইমেন, শেখ সাহেবকে পৌঁছে দেন। চিঠি পড়ার পর শেখ মুজিব বন্ধুকে তোয়াহার সাথে কথা বলার জন্য খুবই তাগাদা দিতে থাকেন।

পরের ঘটনা সম্বন্ধে কমরেড তোয়াহার ডাইরিতে গেখা আছে "পরে আমার শর্ত তিন জন (শেখ, মোহাইমেন, আমি) কথা হবে। সেই মোতাবেক তাঁর ৩২ নম্বর বাসায় রাত সাড়ে এগারটায় পৌঁছিলাম। তবুও বারান্দায় সিরাজুল আলম খাঁন এবং ভিতরে সংসদ সদস্যা বদরুন্নেছার সাথে দেখা হয়ে গেল। পরে অতিথিদের খোঁজ নিতে আসলেন বেগম মুজিব। শেখ, স্ত্রীকে বললেন চিনতে পার কি না। তিনি চিনতে পারলেন না। আমি বললাম, ভাবী আমাকে নিকট থেকেও চিনতে পারছেন না? তিনি গলা শুনে বললেন, 'আরে তোহা ভাই, কেমন দাঁড়ি দুঁড়ি, চিনব কী করে। তিনি আমাদের মিষ্টি নাস্তা দিলেন।'

ইতোমধ্যেই 'মুজিববাদ' প্রশ্নে ১২ই মে ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। শেখের চার

www.pathagar.com

খলীফার মধ্যে ছাত্র নেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকী কথিত 'মুজিববাদ' সমর্থন করেন। কিন্তু সিরাজুল আলম খাঁনের ভাবশিষ্য ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ, মুজিববাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন যে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক সাথে চলতে পারে না। আমরা মুজিববাদ মানি না, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গণশক্তি বন্ধ

মুজিব-তোয়াহা বৈঠকে শেখ সাহেব বুঝতে পেরে ছিলেন যে, স্বাধীনতার নামে ভারত বাংলাদেশকে গিলে ফেলছে। উভয় বন্ধু একমত হয়ে ছিলেন যে, তোয়াহা সাহেব গঙ্গার পানি, সীট মহল ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে গণশক্তি পত্রিকায় লিখবে এবং শেখ সাহেব ঐ খবরের উপর ভিত্তি করে মাঝে মাঝেম এ বিষয়ে ঠাণ্ডাভাবে দু-এক কথা বলবেন। এভাবেই ভারত বিরোধী জনমত গড়ে উঠবে। ঐ বৈঠকের ফলশ্রুতিতে ৫ মার্চ সাপ্তাহিক 'হলি ডে' এবং 'গণশক্তি' পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হয় কমরেড তোয়াহার প্রকাশ্য বিবৃতি।

কমরেড তোয়াহার বিবৃতিতে কমরেড অনীল মুখার্জীসহ কয়েকজন মস্কোপন্থী নেতা শেখ মুজিবকে বিকৃতভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেন। যেহেতু তাঁরা প্রথম থেকেই চেয়েছিল— বাংলাদেশ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হোক। এখানে প্রকাশ থাকে যে, 'সিলেট মেমরেন্ডাম' (গণভোট) ও 'কাশ্মির ভারতে যোগদান' প্রভৃতিতে সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষেই গৃহীত হয়ে ছিল। এ ছাড়া তাঁরা ১৯৬০-৬১ সালে কমরেড তোয়াহার উত্থাপিত পার্টি দলীলে "স্বাধীন বাংলা"র বিরোধিতা করে ছিলেন।

যাই হোক, মস্কোপন্থী নেতারা গোপনে শেখ মণিকে দিয়ে গণশক্তিতে তালা লাগিয়ে দেয় এবং বাসা থেকে তোয়াহা-কন্যা সাহানা চিনু ও রেহেনা পুষ্পকে গ্রোফতার করে সুত্রাপুর থানায় হাজির করেন। এ সংবাদ মুজিব তোয়াহার বন্দুরা ঢাকার ডি. সি. কে জানালে ডি. সি. সাহেব নিজ গাড়িতে করে তোয়াহ কন্যাদ্বয়কে বাসায় পৌছে দিয়ে যান। সাপ্তাহিক গণশক্তিতে আক্রমনের পর আত্মগোপনকারী চীনপন্থীরা আরও গভীর আত্মাগোপনে চলে যান। চীনের স্বীকৃতি ছিঁকাই উঠে। তোয়াহা গ্রুপ ভারত ও মুজিব শাহীর বিরোধী জনমত গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

৭ই মার্চ মুজিব সরকার 'রক্ষীবাহিনী' আদেশ জারি করেন এবং এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতির ৯নং ও ৫০ নং আদেশ জারি করে, দেশে শ্রমিক ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে।

১৭ই মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকা সফরে আসেন। ১৯ই মার্চ উভয় প্রধানমন্ত্রী যুক্ত ইস্তেহার প্রকাশ করেন এবং ২৫ বছর মেয়াদী " বন্ধুত্ব সহযোগিতা

www.pathagar.com

শান্তিচুক্তি" স্বাক্ষর করেন। ২৭ মার্চ স্বাক্ষরিত হয়, "ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি"। ফলে খোলাবাজারের দশ আনা সেরের চাউল হয় ১০ টাকা, আটা আট আনা (৫০ পয়সা) সের তেকে হয় ৭টাকা, আট আনা সের লবণ ৪০টাকা, ৩টাকার লুঙ্গী হয় ২০ টাকা, পাঁচ টাকার শাড়ি ৩৫ টাকায় বিক্রি শুরু হয়।

১৫ই মে মৌলনা ভাসানী 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সরকারি নির্যাতন' এর বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেন। ২১শে মে মৌলনা ভাসানীর ডাকে সারা দেশে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। ২৯ই মে আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ ও মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. বি.) মিলে 'ত্রিদলীয় ঐক্য জোট' গঠিত হয়। এদিকে শেখ মণি রাশিয়ার সাহায্যে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ে। ভারত, বাংলাদেশকে আয়ত্বে রাখার জন্য নিজ সেনা অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে গড়ে তোলে রক্ষীবাহিনী' নামে অপর এক সেনাবাহিনী। ৩১শে অক্টোবর মেজর (অবঃ) জলিল ও রবের নেতৃত্বে আত্ম প্রকাশ করে— জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল (জাসদ)।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম. এল.) অক্টোবর প্লেনামে যে রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেন, তা হলো, " নয়া-উপনিবেশে এজেন্টদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়" বাংলাদেশ সরকারের চরিত্র রুশ-ভারতের উপর নির্ভরশীল সরকার" এবং দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করা হয়, "নয়া-উপনিবেশে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান হতে বাধ্য"। সুতরাং রাজণীতির স্তর হবে—"গৃহযুদ্ধের রাজনীতি"। মুজিব শাহীর বিভিন্ন জনদমনকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে এ পার্টি দেশে প্রতিরোধ গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে।

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি মস্কোপন্থী ছাত্র সংগঠন—বাংলাদেশের ছাত্র ইউনিয়ন ভিয়েৎনাম দিবস পালন উপলক্ষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এই মিছিলটি তোপখানা রোডের মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সামনে এসে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে পুলিশ সোজাসুজি মিছিলে গুলী চালিয়ে দর্শন (সম্মান)-এর শেষ বর্ষের ছাত্র মতিউল ইসলাম ও মীর্জা কাদেরুল ইসলামকে হত্যা করে এবং অনেক ছাত্রকে আহত করে। ২রা জানুয়ারি মস্কো ন্যাপের প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ঘোষণা করেন, আওয়াশী লীগের ছাত্র হত্যা ইয়াহিয়া মোনেম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপের নামান্তর । আমরা দেশবাসীর দাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আশু পদত্যাগ দাবি করছি" এই ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ৩রা জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। এইদিন সিপিবিপ্রধান মণি সিং বলেন, বর্তমান সরকার সম্পুর্ণ অযোগ্য।" ৬ই জানুয়ারি মুজিববাদী ছাত্রলীগের পল্টন জনসভায় শ্লোগান তোলা হয়— "রব-ভাসমানী–মোজাফফর–বাংলার তিন মীরজাফর।" ৮ই জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কম. বারীণ দত্ত বলেন,

www.pathagar.com

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনা ও পাকিস্তানি চরের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।"

৭ই মার্চ সাধারণ নির্বাচন ঢাকার একটি কেন্দ্রে সংঘর্ষ একটি কেন্দ্রেগুলি/জাসদ এর দুজন হাইজ্যাক/ ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী সন্ত্রস চালিয়েছে/কালিগঞ্জেও সন্ত্রস চলছে/ সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই/ পটুয়াখালিতে ব্যালট পেপার ছিনতাই/ কুমিল্লা শহরেব্যাপক সন্ত্রাস নির্বাচন প্রহসনে পরিণত/ রাজশাহীর ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস ইত্যাদির মধ্যদিয়ে ক্ষমতাশীন মুজিব সরকার বিজয়ী হয়। ভোটের পর অনেকটা প্রকাশ্যেই শুরু হয়— আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী/ জয় বাংলাবাহিনী/ লালবাহিনী/ আওয়ামী যুবলীগসহ বিভিন্ন বেসামরিক ও আধা-সামরিক যথা রক্ষিবাহিনীর সদস্যদের বিরোধী দলীয় কর্মী গুম, ব্যাংক ডাকাতি-লুট-খুন নারী হাইজ্যাক ও ধর্ষণের এক বিভিষিকাময় রাজত্ব।

১৯৭৩ সালের ২০ই এপ্রিল সর্বহারা পার্টির সভাপতি কমরেড সিরাজ সিকদার "পূর্ব বালার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট" গঠন করে মুজিব শাহী বিরোধী সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেন।

২২শে মে অনশনরত মৌলনা ভাসানীর অবস্থার অবনতি ঘটে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ), বালাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলা জাতীয় লীগ, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ও নিজ দলীয় (ন্যাপ) নেতৃবৃন্দের অনুরোধে মৌলানা (ঢাকা মেডিকেলে) অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ জাসদ পল্টন ময়দানের জনসভা শেষে মিছিলসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর সরকারি বাসভবন ঘেরাও করে। ঘেরাও কালে জনতা পুলিশ মারামারি বাধে এবং এখান থেকে জাসদ নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

১৪ই এপ্রিল মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ও নেতৃত্বে মুজিব শাহীর চরম দমন-পীড়ন বিরোধী একটা সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। এই ফ্রন্টে যোগদানকারী দলগুলো ছিল ন্যাপ (ভাসানী) জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন , কমিউনিষ্ট পার্টি (লেলিনবাদী) সিপিবি (হাতিয়া গ্রুফ), জাতীয় লীগের উভয় গ্রুপ এবং শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল।

২৩শে এপ্রিল মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঐক্যফ্রন্টের পল্টন ময়দানের জনসভার বিপুল গণউপস্থিতি দেখে শেখ মুজিব কয়েকটি জেলা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সকল প্রকার রাজনৈতিক সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জুলাই মাসে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদম প্রেরিত গত অক্টোবরে বাংলাদেশের দেওয়া চা উপহারের প্রতি-উপহার হিসাবে ৩০ টি টি-৫৪ ট্যাক ও ৪০০ রাউন্ট ট্যাংকের গোলা বাংলাদেশে পৌছায়।

২৮শে নভেম্বর মুজিব সরকার সারা দেশে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করে সংবিধানের কয়েকটি ধারা স্থগিত করে।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ৩রা জানুয়ারি সরকার 'জরুরি ক্ষমতা বিধি' জারী করে সারা দেশে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী সংযোজন করে শেখ মুজিব, একনেতা এদদলের সৃষ্টি করেন। ফলে দেশে শাসক আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দলের রাজনীতি করা আইন দ্বরা বে-আইনী করা হলো।

২৪শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের এক আদেশে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল— বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলো। এই নতুন দলে ঠাঁই পেলো আওয়ামী লীগ ছাড়া মস্কোপন্থী ন্যাপ ও সিপিবি নেতারা।

অতঃপর বাকশাল ও তার অঙ্গসংগঠন— আওয়ামী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, লালবাহিনী এবং পার্টি নিয়ন্ত্রিত রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের অত্যাচার জুলুমে দেশের জনগণ মূমুর্ষ, তখন ক্ষমতাশীন দলীয় কর্মীরা শ্লোগান তোলে এক নেতা এক দেশ— বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। এরাই বাংলাদেশকে লুটেপুটে করল শেষ। এমনি এক রুদ্ধ শ্বাস পরিবেশে থেকে জনগণ মুক্তির পথ খুঁজছিল এবং কমরেড তোয়াহার সাম্যবাদী সিরাজ সিকদার সর্বহারা পার্টি কমরেড আব্দুল হকের পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমরেড মতিন টিপুর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলারা যখন মুজিব শাহীর শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মরণ পন সংগ্রামে লিপ্ত, তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লে. কর্ণেল ফারুক, লে. কর্ণে রশিদসহ কয়েকজন দেশ প্রেমিক সেনাঅফিসার বিদ্রোহ করে- ১৫ই আগস্ট ভোরে শেখ মুজিব ও তার পরিবার বর্গকে হত্যা করে। রাজধানীতে শেখ হত্যার খবর প্রচার হওয়ার সাথে সাথেই নগরবাসীরা রাস্তায় নেমে পড়ে এবং বিদ্রোহী সেনাদলেরর সদস্যদের সাথে কোলাকুলি করে তাদের পক্ষে আনন্দ মিছিলে অংশ নেয়। জনগনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সকাল দশটার মধ্যে শহরের প্রায় সকল মিষ্টির দোকান মিষ্টি শূন্য হয়ে যায়।

সেনা-অভ্যুত্থানের নেতারা খন্দকার মোস্তাক আহমদকে দেমের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহনের জন্য আবেদন করেন। প্রেসিডেন্ট মোস্তাক রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়ে বাকশাল তথা একদলীয় রাজনীতি বাতিল করেন এবং পযায়ক্রমে জেলা গভর্ণর, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সরকারি কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিঘ্নকারী সকল প্রকার আইন বাতিল করে।

১৬ই আগস্ট সউদী আরব এবং ৩০শে আগস্ট গণচীন, বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতী দেয়। ভারতীয়রা নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তারা নতুনভাবে ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ে।

প্রেসিডেন্ট মোস্তাক, সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য-সেনা প্রধান লে. জে. শফিউল্লাহকে চাকুরি চ্যুত করে, মে. জে. জিয়াউর রহমানকে 'চীফঅব ডিফেন্স ষ্টফ' এবং জিয়ার ডেপুটি হিসেবে মে. জে. এরশাদকে নিয়োগ দেন। এই সাথে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফকে 'চীফ অব জেনারেল স্টাফ' পদে এবং মে. জে. খলিলুর রহমানকে বি. ডি.

www.pathagar.com

আর এর প্রধান নিয়োগ দেন। ২০শে আগস্ট মে. জে. জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন।

২৬শে সেপ্টম্বর প্রেসিডেন্ট কন্দকার মোস্তাক আহম্মদ, "শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না" এই মর্মে এক ডিগ্রী জারি করেন। ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানে জড়িত ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৩রা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট বেতার ও টিভি-তে ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৭৬ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর আরোপিত সমস্ত নিষেদাজ্ঞা তুলে দেওয়া হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু ২ নভেম্বর রাতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ও কর্ণেল শাফাত জামিল -এর নেতৃত্বে আর একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ফাস্ট ইস্টবঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ, জে. জিয়াকে গৃহবন্দি করেন। ৩ নভেম্বর রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারগারে চার আওয়ামী লীগ নেতা– (১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, (২) জনাব তাজ উদ্দিন, (৩) কামরুজ্জান ও (৪) মুনসুর আলীকে হত্যা করা হয়। এই রাতেই বিদ্রোহী নেতারা– ডালিম, নূর, হুদা, পাশা, শাহারিয়ারসহ ১৭ জন সেনা–অফিসারকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন এবং খন্দকার মোস্তাককে ও পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ৪ই নভেম্বর জেনারেল জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ সেনাপ্রধানের পদটি দখল করেন। ৬ নভেম্বর সেনাপ্রধান, প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে বাংলাদেশের ৫ম প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করেন। রাত ১২টার পর ঢাকা সেনানিবাসের সৈন্যরা জাসদ সমর্থিত গণবাহিনীপ্রধান লে. কর্ণেল (অবঃ) আবু তাহেরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং ৭ই নভেম্বর ভোরে সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বের হয়ে সেনানিবাস ও শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বেঙ্গল ল্যান্সারের হাবিলদার সারওয়ারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে মুক্ত করে।

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে সকালে খালেদ মোশারফ-৭২ পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার কর্ণেল খন্দাকার হুদা এবং ৮ম ইস্টবেঙ্গল কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল হায়দারকে সাথে করে বঙ্গ ভবন থেকে সেনানিবাসে ফেরার পথে ফার্মগেটের কাছে একদল বিদ্রোহী সেনার হাতে তিনজনই নিহত হন।

জেনারেল জিয়া, বন্দি মুক্ত হয়ে বিদ্রোহী সৈন্যগণকে সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন এবং লে. ক. তাহের নেতৃত্বে হারায়ে আত্ম গোপন করেন। প্রেসিডেন্ট সায়েম, সামরিক আইন প্রশাসক এবং জিয়াউর রহমানকে উপ-সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

www.pathagar.com

এই দিন-মে. জলিল, আ.স.ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ প্রমুখ জাসদ নেতারা জেল মুক্ত হন। জাসদের নেতৃত্বে সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত ও পরিচালিত হলেও ক্ষমতা জে. জিয়ার হাতে চলে যাওয়ায়, তারা জিয়ার বিরুদ্ধে আর একটি সেনাবিদ্রোহ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ফলে ২৩শে নভেম্বর থেকে জাসদ নেতাদের ফের গ্রোফতার শুরু হয়।

১৯৭৬ সালের ২১শে জুন জেরেরর মধ্যে ৩৩ জন সাসদ নেতার বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। ১৭ই জুলাই কর্ণেল তাহেরকে বিচারের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় এবং ২১শে নভেম্বর মৃতুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ২৮শে নবেম্বর মে. জে. জিয়াউর রহমান, প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি কেড়ে নেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন— ডেপুটি চীফ অব আমী স্টাফ— মে. জে. মো. এরশাদ হোসেন ওরফে হুসেন মো. এরশাদ; চীফ অব জেনারেল স্টাফ-মে. জে. মঞ্জুর, নবম ডিভিশনের কমান্ডার মে. জে. মীর শওকত আলী; নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধান এবং প্রেসিডেন্টের সহকারী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার।

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট সায়েম, জেলারেল জিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। তিনি স্বঘোষিত লে. জেনারেল পদে উন্নত হন এবং ইহা কাগজ পত্রে ১৯৭৮ সালের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত কার্যকর করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার জন্য, ভাসানী ন্যাপ ও মুসলিম লীগের অনুসারীদের নিয়ে গঠন করেন—বাংলাদেশের জাতীয়তাবদী দল (বি. এন. পি)। জুন মাসের সাধারণ নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশের অষ্টম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেয়ে দেশের সংবিধান সংশোধন করেন। এই সংশোধনীর মধ্যে উল্লোখযোগ্য হলো (১) সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' (২) জাতীয়তা— বাঙালির পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' এবং (৩) একদলীয় শাসন ব্যবস্থার স্থলে বহুদলীয় গণতন্ত্রী ধারা প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া, গণচীন ভ্রমণ করে দেশে ফিরে এসে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে 'খাল কাটা' বিপ্লাব শুরু করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে প্রেসিডেন্ট জিয়া, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি দেন।

ফলে ১৯৮০ সালের ১৭ই মে, শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন।

৩০শে সেপ্টম্বর বগুড়া সেনানিবাসে অবস্থানরত ২২ ইস্টবেঙ্গল রেডিমেন্ট, জিয়া শাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে এবং পরদিন ঢাকা সেনানিবাসে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া, এই সেনাবিদ্রোহ কঠিন হাতে দমন করে। ১৪৪৩ জন বিদ্রোহী সেনা ও অফিসারকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং কয়েক শত বিদ্রোহীকে জেলে বন্দি করা হয়।

www.pathagar.com

এই বিদ্রোহের সাতে জড়িত থাকার সন্দেহে— জাসদ, সি. পি. বি. ও ডেমোক্রেটিক লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ডিসেম্বরে বিমানবাহিনীর প্রধান এ. জি. মাহমুদকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে মধ্যরাতে চট্টগ্রামের সেনাবিদ্রোহে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন।

অতঃপর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আ. সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজ দলীয় মন্ত্রিসভা থেকে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী ও দুর্নীতিবাজ নেতা-কর্মীদের বহিস্কার করেন। পরিশেষে দেষে সুষ্ঠ অবস্থা ফিরে আসে। কিন্তু চরম ক্তা লোভী সেনাপ্রধান হুসেন মো. এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ দেশে সামরিক আইন বলবত করে জোর করে রাষ্টক্ষমতা দখল করেন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার জন্য মরহুম জিয়া প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের নাম "জাতীয় দল"।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ন্যাশনাল পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত শিশু-কিশোর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বই

কিশোর সাহিত্য

আলী ইমামের সেরা রোমাঞ্চকর অভিযান সিরিজের বই

পায়ে পায়ে মৃত্যু	আলী ইমাম	৫০.০০
অজানা দূর দেশের খোঁজে	আলী ইমাম	৫০.০০
ভয়ঙ্করের হাতছানি	আলী ইমাম	৫০.০০
দুর্গম পথের অভিযাত্রী	আলী ইমাম	৫০.০০
পাল তুলেছে ঝড়ের মুখে	আলী ইমাম	৫০.০০
গহীন বনের পথে পথে	আলী ইমাম	৫০.০০
নীল সাগরের ঢেউয়ের দোলায়	আলী ইমাম	৫০.০০
পাহাড় চূড়ায় আগুন জ্বলে	আলী ইমাম	৫০.০০
পিশাচ দ্বীপের ভয়াল প্রাণী	আলী ইমাম	৫০.০০
রক্ত ভেজা পথের শেষে	আলী ইমাম	৫০.০০

কিশোর গল্পগ্রন্থ

আবিষ্কারের গল্প	মেহেরুন্নেসা মেরী	৫০.০০
একাত্তুরের শিশু ভূত	নাসিম হাসান কেয়া	৩০.০০
বাংলাদেশের আদিবাসী	কুমার প্রীতীশ বল	৫০.০০
আদিবাসী রূপকথা	আ.ন.স. হাবীবুর রহমান	৬০.০০
লাল পাহাড়ীর দেশে	কুমার প্রীতীশ বল	৫০.০০
গ্রামীন আনন্দ	আতাউল ইসলাম সবুজ	৫০.০০
শিশুর দাবি	আতাউল ইসলাম সবুজ	৫০.০০
ঈশপের মজার গল্প	কচি সিদ্দিকি	৬০.০০
বিজ্ঞানের মজার গল্প	মেহেরুন্নেসা মেরী	৫০.০০
পুতুলের বিয়ে	মেহেদী হাসান	৬০.০০
যাদের বলে সমাজ চলে	মেহেদী হাসান	৪০.০০
বিন লাদেনের অজানা কাহিনী	এইচ.এম.খলিল সম্পাদিত	৫০.০০
দি সোর্ড অব টিপু সুলতান	ভগওয়ান এস. গিদওয়ানী	৭০.০০
দেশ বিদেশের রূপকথা	এইচ.এম. খলিল সম্পাদিত	৬০.০০

সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে তৈরী মজার গল্পের বইয়ের সিরিজ সুনীতির মজার গল্প ৮ বছর বয়সের নিচের শিশুদের জন্য

সুনীতির মজার গল্প	১	(লাল সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	২	(লাল সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	৩	(লাল সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	৪	(লাল সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০

www.pathagar.com

৮ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে শিশুদের জন্য

সুনীতির মজার গল্প	১	(সবুজ সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	২	(সবুজ সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	৩	(সবুজ সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	৪	(সবুজ সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	৫	(সবুজ সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০
সুনীতির মজার গল্প	৬	(সবুজ সিরিজ)	সম্পাদনায় আইয়ুব হোসেন	১৫.০০

ভ্রমণ কাহিনী

বাংলাদেশ ভ্রমণ গাইড	খসরু চৌধুরী	১৫০.০০
দেশে বিদেশে (ভ্রমণ কাহিনী)	সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী	৬০.০০
লিলিপুটের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)	জোনাথন সুইফ্‌ট	৫০.০০
সমুদ্র সৈকতে টারজান (ভ্রমণ কাহিনী)	এইচ.এম. খলিল সম্পাদিত	৫০.০০
লাপুটাদের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)	জোনাথন সুইফ্‌ট	৫০.০০
ফেলুদার সফর সঙ্গী (ভ্রমণ কাহিনী)	সত্যজিৎ রায়	৫০.০০

কিশোর জীবনী গ্রন্থ

আমার ছেলেবেলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০.০০
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	এনায়েত রসুল	৫০.০০
বিদ্রোহী কবি নজরুল	এনায়েত রসুল	৫০.০০
বেগম রোকেয়া	এনায়েত রসুল	৫০.০০
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান	এনায়েত রসুল	৫০.০০
বিজ্ঞানী আইনস্টাইন	সাবরিনা নাসের	৫০.০০
পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন	রুহুল আমিন বাবুল	৫০.০০
মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী	আবু জাফর মোস্তফা সাদেক	৫০.০০
বেগম সুফিয়া কামাল	এনায়েত রসুল	৫০.০০
মাদার তেরেসা	এনায়েত রসুল	৫০.০০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	এনায়েত রসুল	৫০.০০
শেরে বাংলা ফজলুল হক	এনায়েত রসুল	৫০.০০
বাংলার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু	এনায়েত রসুল	৫০.০০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব	এনায়েত রসুল	৫০.০০
মরমী কবি হাসন রাজা	আ.ন.স. হাবীবুর রহমান	৫০.০০
বাউল লালন সাঁই	কুমার প্রীতীশ বল	৫০.০০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	আবু রেজা	৫০.০০
বিপ্লবী কবি সুকান্ত	আবু রেজা	৫০.০০
উপমহাদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী	মেহেরুন্নেসা মেরী	১৫০.০০

স্বাস্থ্য বিষয়ক

স্বাস্থ্য যখন ভাবায়	ডা. শামীমা সুলতানা	১৫০.০০
আমার মা আমার প্রথম ডাক্তার	অধ্যাপক সাহেরা খাতুন বেলা	১০০.০০

আপনার পছন্দের বইটির জন্য আপনার পার্শ্ববর্তী বইয়ের দোকান অথবা সরাসরি ন্যশনাল পাবলিকেশন-এ যোগাযোগ করুন।
ন্যাশনাল পাবলিকেশন- ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল ঃ ০১৭১-৫৮৪২৬২
www.pathagar.com